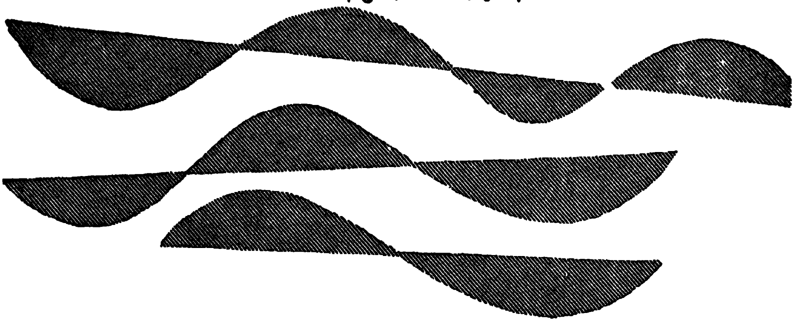
নদীর সঙ্গে দেখা



বরেন গঙ্গোপাধ্যায়



নবপত্র প্রকাশন কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৫৯

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক : যশোদা সাহা
নিউ এজ প্রিণ্টার্স
৮০ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

বিভূতি রায়
প্রিয়বরেষু

মধুসূদন গিরির ষাট পেরিয়েছে, কিন্তু ওর জীবন-সঙ্গিনী ফুল্ল বা ফুল্লরা এখনো তিরিশ ছুঁতে পারে নি। লোকে জানে, ফুল্লরা মধুবাবুর শেষ জীবনের কেপ্‌ট। অর্থাৎ তিন নম্বর।

শোনা যায়, মাঝখানে একটি দু নম্বরও জুটেছিল, সেটির সঙ্গে মধুবাবুর বনিবনা হয় নি। শেষপর্যন্ত মধুবাবু তাকে গলায় গামছা দিয়ে নাকি বিদেয় করেছিলেন। ফলে, বর্তমানে এই তিন নম্বর অর্থাৎ ফুল্লই মধুবাবুর ইহকাল পরকাল। যে যাই ভাবুক, এই ফুল্লই ওর শেষ জীবনের গয়াকাশী।

মধুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসার আগে শিবু এই ফুল্লরা সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানত না। এ অঞ্চলে বলতে গেলে ওর এই প্রথম আসা। নেহাত এই গাইগাছার পাশের গ্রাম গোশিঙায় কৃষক সম্মেলনের আয়োজন হয়েছে। এবং সেই সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য শিবু উৎসাহ নিয়ে ছুটে এসেছে। তাই বুড়োর সঙ্গে দেখা না করে যাওয়াটা অন্যায়। এককালে শিবুর বাবা হরিশ্চন্দ্র আর এই মধুবাবু জয়েণ্ট মোটর লঞ্চের ব্যবসা করতেন। তখন দুই পরিবারের মধ্যে ছিল গভীর হৃদ্যতা। শিবু অবশ্য তখন নেহাতই ছোট। তবু ওর মধুবাবুর প্রথম স্ত্রী গিরিবালার কথা বেশ মনে আছে। তখন ওঁরা প্রায়ই মেদিনীপুরের চন্দনতলার বাড়িতে এসে উঠতেন। গিরিবালার কোলে অনেক ঝাঁপাঝাঁপিও করেছে শিবু। সেই স্মৃতিই ওর মাথায় ছিল। আর তাইতেই ও ভেবে রেখেছিল মধুবাবুর সঙ্গে দেখা না করে ও ফিরবে না।

গোশিঙায় এসে শিবু মধুবাবু সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানতে পারল, মধুবাবু লোকটা এতদিনে এ অঞ্চলে বেশ দুর্নাম কিনে রেখেছে। ঐ ফুল্লই নাকি মধুবাবুকে নাকে সুতো বেঁধে ঘোরায়। উঠতে বললে

ওঠে, বসতে বললে বসে। মধুবাবুকে দিয়ে নিজের নামে নাকি একটা বাড়িও বানিয়ে নিয়েছে মহিলাটি। আর মধুবাবু হাসিমুখেই নাকি বাড়িটা তৈরি করেছেন। আজ আছেন কাল নেই, ফুল্লর ভবিষ্যৎ ভাবনা ভেবে রেখেছেন।

এসব কথা শুনে শিবুর অবশ্য খারাপ লাগে নি। সাতকুলে মধুবাবুর কেউ নেই যে তাঁদের জন্য রাখবেন। বরং ফুল্লরা যদি এই বৃদ্ধ বয়সে মধুবাবুকে দেখাশোনা করে তার জন্য কিছু করে যাওয়ার পেছনে অন্যায় নেই। সেই অর্থে মধুবাবু আগের মতোই দরাজ প্রাণ রয়ে গেছেন।

আজ অবশ্য গিরিবালা বেঁচে থাকলে মধুবাবুকে এত দুর্নামের ভাগীদার হতে হত না। সন্দেহ নেই, গিরিবালাই সব কিছু পেত। কিন্তু গিরিবালা গত হয়েছেন বেশ কয়েক বছর আগে। এই ক-বছরে অনেক জল গড়িয়েছে, লঞ্চের ব্যবসাও ফেল মেরে গুটিয়ে গেছে। তাছাড়া দুই পরিবারে যোগাযোগও ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। ফলে, গাইগাছায় এসে মধুবাবুর সঙ্গে দেখা করাটা দায়িত্ব বলেই মনে করেছিল শিবু। আর সেই সুবাদেই সারাদিন সমিতির ছেলেদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে সন্ধ্যার বেশ কিছু পরে মধুবাবুর নতুন বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল শিবু।

ওদিকে দিনটা আজ কপালগুণেই খুব একটা সুবিধার । না। সারাদিন ঝিমঝিম বৃষ্টি হয়েছে। পথঘাটের অবস্থা বর্ণনায় আসে না। যেখানেই পা দাও, পেছল। তাছাড়া গ্রামের ঝোপঝাড় জঙ্গলের ভেতর থেকে তারস্বরে সারাদিন ব্যাঙ ডেকেছে। বৃষ্টি বাঁচাতে গাছগাছালির নিচু দিয়ে চলবারও উপায় ছিল না, বাতাসে ঝুরঝুর করে বড় বড় জলের ফোঁটা নেমে এসে ভিজিয়ে ছেড়েছে। এমন দুর্যোগ হবে জানলে দেশ-বাড়ি ছেড়ে এই তিরিশ-চল্লিশ মাইল দূরে কৃষক সম্মেলন করতে কে আসত। বাড়িতে পুষ্প মা জানি ওর জন্য এখন আকাশ-পাতাল ভাবতে বসেছে। এমনিতেই একটু বেশি ভাবে পুষ্প।

একে আবহাওয়া খারাপ, বৃষ্টি, তার ওপর বার বার পুষ্পর কথা মনে পড়ে যাওয়ায় মেজাজটা শিবুর ভাল ছিল না। কিন্তু উপায় কি, যেখানে যেমন সেখানে তেমনভাবেই চলা উচিত। প্রকৃতির ওপর ডাণ্ডাবাজি চলে না।

বিকেলের দিকে অবশ্য বৃষ্টিটা পুরোপুরি থেমে এসেছিল, বাতাসও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর আকাশে পর্দায় পর্দায় মেঘ জমা শুরু হয়েছিল। এরপর যদি নামে, মুষলধারে নামবে। বুঝিয়ে দেবে বৃষ্টি কাকে বলে!

অবস্থা দেখে মধুবাবুর বাড়িটাই নিরাপদ আস্তানা বলে ভেবে নিয়েছিল শিবু। অন্ধকারে বাড়ির দরজায় এসে বার দু-তিন ডাকার পর নারীকণ্ঠের উত্তর শুনতে পেল, কে?

শিবু উত্তর করল, আমি শিবনাথ, চন্দনতলা থেকে আসছি। দরজা খুলুন না।

—চন্দনতলা! দরজা খুলে যে মহিলাটি বেরুল সেই মধুবাবুর বর্তমান জীবনসঙ্গী ফুল্লরা। হাঁ করে একপলক দেখে নিল শিবু। বয়স কিছুতেই তিরিশের বেশি হতে পারে না। চোখে-মুখে ধকধক করছে যৌবন, পিঠ খোলা চুল মেঘের মতো ফুলে আছে। তাকাতেই কেমন ঘাবড়ে গেল শিবু। মধুবাবু সম্পর্কে অনেক কথাই ওর শোনা, কিন্তু এই ফুল্লরা ওর নতুন অভিজ্ঞতা।

ফুল্লরা পান চিবোচ্ছিল বোধহয়। একবার আপাদমস্তক দেখে নিল শিবুর। তারপর ধারালো প্রশ্ন, কাকে চাই?

শিবু বিনয় মিশিয়ে বলল, এটা মধুসূদনবাবুর বাড়ি তো? মধুসূদন গিরি?

—এত রাতে কি দরকার ওর সঙ্গে? পালটা প্রশ্ন করে ফুল্লরা। গলার স্বরে যেন ছুরির ফলা।

কি একটা বলতে যাচ্ছিল শিবু, এমন সময় হঠাৎ ভেতর থেকে মধুবাবুর গলা পাওয়ায় যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

—কে এয়েছে ফুল্ল ? কার সঙ্গে কথা কইচ ?

ফুল্লরা ঘরের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে উত্তর করল, বলছে, চন্দনতলা থেকে এয়েছে, শিবনাথ। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

শিবনাথ আর চন্দনতলা এই শব্দ দুটোই যথেষ্ট, মধুবাবু হুমড়ি খেয়ে দরজার কাছে এসে ঝুঁকে দাঁড়ালেন, আরে শিবু! তুই! আয় আয়, ভেতরে আয়।

শিবু ঘরে ঢুকল। মেয়েটার চোখে কৌতুক, ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রইল শিবুর দিকে।

একটু এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে মধুবাবুকে প্রণাম করল শিবু। আপনার এ কী চেহারা হয়েছে মেসোমশাই! অসুখ নাকি ?

মধুবাবু ম্লান একটু হাসলেন, অসুখ তেমন একটা বড় কিছু না বাবা, তবে দিন কয়েক ধরে বড্ড টান চলেছে। দাঁড়ালেই মাথা ঘোরে।

—শরীরটা কিন্তু একদম ভেঙে গেছে আপনার।

মধুবাবু কাছে টেনে নিলেন শিবুকে, আয়, কাছে আয়, কতটুকু দেখেছি তোকে অ্যাঁ! আমিও আর খোঁজ-খবর নিতে পারি না, তোরাও আমাকে ভুলে গেছিস।

—না না, ভুলব কেন, ভুললে কি আর আসি। সাফাই গাইল শিবু।

মধুবাবু শুকনো শিঠনো একটা হাত এগিয়ে দিয়ে শিবুর গায় বুলিয়ে নিলেন, তারপর ফুল্লরার দিকে তাকিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, ওগো শুনছ, চিনে রাখ, তোমাকে হরিশের গল্প বলেছি না, এ হচ্ছে সেই হরিশ্চন্দ্রের মেজ ছেলে, আমাদেরও ছেলের মতো। তা বাবা, এই দুর্যোগের দিনে হঠাৎ কোত্থেকে ? বাড়ির সবাই ভালো তো ?

শিবু বলল, ভালো, আসলে আমি একটা কাজে এসেছিলাম এদিকে, ভাবলাম এত কাছে যখন এসেছি, তখন দেখা না করে ফিরব না।

মধুবাবুর দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল বোধহয়, খাটে গা এলিয়ে দিলেন। ফুল্লরা এগিয়ে এসে ওঁর পিঠের দিকে একটা বালিশ গুঁজে দিল। তারপর মধুবাবুর পায়ের কাছে পা ঝুলিয়ে বসে পড়ল।

খাটের কাছে একটা টুল টেনে নিয়ে বসল শিবু। ঘরে একটা ফুলকলি আঁকা ওআললাম্প জ্বলছে, সুন্দর দেখতে। পয়সাওয়ালা বাড়ি ছাড়া এ ধরনের ল্যাম্প থাকে না। দেয়ালে দেবদেবীর ছবি টাঙানো। পাপী লোকদেরই দেবদ্বিজে ভক্তি বেশি থাকে বোধহয়। তাচ্ছিল্যের চোখে শিবু ওআললাম্পটা দেখল।

—এদিকে হঠাৎ এমন কি কাজ পড়ল শিবু? কখন এয়েছিস?

শিবু বলল, কাজ মানে, গোশিঙায় পরশু থেকে কৃষক সম্মেলন হবে, শুনেছেন নিশ্চয়ই। বিরাট সম্মেলন, তাই আর কি!

মধুবাবু এবার তেরছা চোখে তাকালেন, কৃষক সম্মেলন, তা তুইও ওসবে আছিস নাকি?

শিবু বলল, গ্রামের মানুষেরই সম্মেলন ওটা। অনেক বড় বড় নেতারা সব আসবেন।

কনুইয়ে ভর দিয়ে দেহটাকে একটু ঝুঁকিয়ে ধরলেন মধুবাবু, আমার মতো পঙ্গু লোকের কাছ থেকেও জুলুম করে একবস্তা চাল নিয়ে গেছে ওরা। তুই যে ওসবের মধ্যে আছিস, জানতুম না তো!

—এত বড় সম্মেলন এই পাড়াগাঁয়ে এর আগে আর কখনো হয় নি মেসোমশাই, আপনাদের সাহায্য পেলেই তো সম্মেলন সার্থক হবে।

একথা বলতে কেমন যেন বুকে একটা আলাদা বল পায় শিবু। বলা শেষ করে ফুল্লরার দিকে একবার তাকায়। যেন ফুল্লরার কাছে নিজের আসল পরিচয়টা এতক্ষণ পর ও দিতে পেরেছে।

মধুবাবু কিছুক্ষণ হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইলেন, বাড়িতে বলে এয়েচিস তো?

শিবু উত্তর করল, সবাই জানে।

—জানে, কিছু বলে না ?

—বলার কি আছে! আমি তো অন্যায় করছি না। অন্যায় করলে কথা ছিল।

মধুবাবু খুশি হলেন কিনা বোঝা গেল না। শিবুর আপাদমস্তক আর একবার ভাল করে দেখে নিলেন, তা সারাদিন বুঝি জলে ভিজে জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ করা হয়েছে ?

ফুল্লরার দিকে তাকাল শিবু। ফুল্লরা তখনো কেমন ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে। ওঁর চোখের দৃষ্টিটা কেমন অন্যরকম, তাকাতে গেলেই চোখ পিছলে যায়।

—ভিজি নি ঠিক, তবে সারাটা দিন যা গেল! প্যাণ্ডেল বানাবার জন্য সবে বাঁশ ত্রিপল এনে জড়ো করা হয়েছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত ভেসে যাবে কিনা কে জানে! সবাই মিলে এত খাটা-খাটনি করছে, সব তাহলে ভেস্তে যাবে।

—খাওয়া-দাওয়া কোথায় হল ?

শিবু এবার সত্যি কথাটাই বলতে পারত, খাওয়া-দাওয়া আজ তেমন কিছুই জোটে নি ওর। কিন্তু এ বাড়িতে দুটি মাত্র প্রাণী, একটা রুগী আর একটা ঐ ফুল্লরা। ফুল্লরার গালে পান রয়েছে, এ অবস্থায় খাওয়ার কথা বলা যায় না। শিবু বলল, খেয়ে এসেছি। রাতে শুধু একটু শোবার জায়গা দরকার।

—শুবি তো বটেই। ওগো শুনছ, বাইরের ঘরটা তো খালি পড়ে আছে, ওখানেই ওকে বিছানা করে দাও। আর একটা লণ্ঠন দিও ওর ঘরে। দেখো, যেন অসুবিধা না হয়।

ফুল্লরা খাট থেকে নামে। ভঙ্গিটা কেমন মাখো-মাখো।

—বাইরের ঘরটা কি হয়ে আছে কে জানে! দাঁড়াও দেখি, ঝাট-পাট দিয়ে গুছিয়ে আসি।

একটা কুপি জ্বালিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ফুল্লরা।

—কোথায় খাওয়া হল ? প্রশ্ন করলেন মধুবাবু।

শিবুর মুখটা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে, খেয়ে নিয়েছি এক জায়গায়। খেয়েই আসছি।

—কেন এখানে খেলে কি জাত যেত? এদিকে এয়েছিস, আগে আমাদের খবর দিবি তো, মাছ-ফাছ ধরিয়ে রাখতাম। পুকুরের মাছ তো আর ঘরের লোকে খায় না, সব অদানে অব্রাহ্মণে যায়। কাল কিন্তু বাপু, বাইরে কোথাও খাওয়া চলবে না। এখানেই খেতে হবে। ক-দিন থাকবি বলে ভেবেছিস?

শিবু বলল, সম্মেলন হবে তিনদিন। শেষ হয়ে গেলেই ফিরব।

—তিনদিন হোক, দশদিন হোক, এখানেই থাকবি কিন্তু। ঠিক তো?

শিবু মাথা নাড়ল, দেখি, অবস্থা বুঝে। সম্মেলনের জন্য বেশ ধকল যাচ্ছে মেসোমশাই। তার ওপর যা আবহাওয়া দাঁড়াল, তাতে কি অবস্থা দাঁড়ায়, দেখে নিই।

মধুবাবু কেমন একটু থমকে রইলেন, তা তো বটেই, হরিশ থাকলে কিন্তু এরকম কথা বলতে পারত না। আজকাল সব কিছুই কেমন যেন পালটে যাচ্ছে।

—না মেসোমশাই, তা নয়। শিবু ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, আমি চেষ্টা করব, যাতে এখানেই থাকতে পারি।

এমন সময় আকাশ চিরে একটা বাজ পড়ল। বৃষ্টিটা এল বুঝি। খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকায় শিবু। বাইরে আলকাতরার মতো অন্ধকার নেমেছে। বৃষ্টি নেই, কেবল বাজই। হয়তো ধারেকাছেই কোথাও শুরু হয়ে গেছে। কেমন অস্বস্তি লাগে শিবুর। এমনিতেই ঝামেলার শেষ নেই, তার ওপর যদি আবার বৃষ্টি-বাদলা শুরু হয়, কে রক্ষা করবে।

উঠোনে অন্ধকারের মধ্যে একটা কুকুর চেঁচিয়ে উঠল। চেঁচানিটা ভারি অদ্ভুত। বাজের শব্দে ভয় টয় পেয়েছে বোধহয়। কৌতুকে তাকিয়ে থাকে শিবু। না, কুকুরটা চেঁচাতে চেঁচাতে উঠোন পেরিয়ে

সামনের ফাঁকা মাঠের দিকে চলে গেল। ওদিকে শ'তিন চার হাত দূরে নদীর বাউণ্ডারি। ঐ বাউণ্ডারির ওপর দিয়েই হেঁটে এসেছে শিবু।

মধুবাবু বললেন, তুই শিবু, তোর বাপের একেবারে উল্টোটা হয়েছিস। তোর বাপ কিন্তু এসব কিছুই পছন্দ করত না। কোথায় খাবি-দাবি, সুখে ঘরকন্না করবি, তা না, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান।

শিবু চুপ করে থাকে। এসব কথা ওর হাজারবার শোনা।

—তুই তো মানুষের জন্য কত করিস, কিন্তু তোর যদি পেটে ভাত না থাকে, কেউ ফিরেও তাকাবে না দেখিস। বয়স তো আর কম হল না আমার, কত দেখলাম।

এবারও উত্তর না দেওয়াই ভাল। কুকুরটা মাঠ পেরিয়ে আবার ছুটতে ছুটতে ফিরে আসছে। বাইরের দিকে তাকায় শিবু। আর এমন সময় ফুল্লরার সাড়া পাওয়া গেল, কৈ গো কুটুম, শোবে যাও। বিছানা হয়ে গেছে।

ফুল্লরা তেলের কুপি হাতে ঘরে ঢোকে। আর সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল শিবু।

মধুবাবু বললেন, হ্যাঁ শিবু, রাত হয়ে যাচ্ছে, কাল সকালে উঠে আবার কথা হবে। তারপর ফুল্লরার দিকে তাকালেন, ওকি, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ঘরটা একবার বুঝিয়ে দেবে তো। ওকে পর-পর ভাবতে শুরু করলে নাকি গো?

শিবুর অস্বস্তি লাগে, না না, কোন ঘরটা বলুন, আমি একাই যেতে পারব।

ফুল্লরাও অভিভাবক হয়ে ওঠে, খুব হয়েছে, সঙ্গে এসো দেখি, দেখিয়ে দিই।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, যাও। রাতে জল-টল খাও তো শিবু? ওগো, ওকে জিজ্ঞেস করে নিও।

ফুল্লরাকে যেন মধুবাবুই ঠেলে পাঠিয়ে দিলেন শিবুর সঙ্গে।

শিবু অগত্যা অসহায় অবস্থায় পেছন পেছন হেঁটে এল ফুল্লরার। এসময় আর একবার নিঃশব্দ বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। পলকেই শিবু দেখল, সমস্ত পৃথিবী ভয়ানক মূর্তি ধরেছে, যেন আর দু-দণ্ড পরেই মহাপ্রলয় শুরু হবে।

উঠোনের পশ্চিম দিকে একটা ঘর। ঘরের পেছন দিকে বোধহয় গোয়াল। অন্ধকারে ঠিক চেনা গেল না, জিজ্ঞেসও করা গেল না। হোক না গোয়াল, ক্ষতি কি! কোথায় কোন আদাড়ে-বাদাড়ে পড়ে থাকতে হত, তার চে এ স্বর্গ।

ফুল্লরাকে অনুসরণ করে ঘরে ঢোকে শিবু। ছোট্ট ঘর। একপাশে একটা খাট, তাতে বিছানা পাতা। ঘরের ওপাশে একটা জানলা। জানলাটা ভেজান রয়েছে। জানলার একপাশে ত্রিবর্ণ পতাকা হাতে ভারতমাতার একটা রঙিন ক্যালেণ্ডার। সন তারিখের পাতাগুলো অনেক আগেই ছিঁড়ে উঠে গেছে। একপাশে মাটির দেয়ালে আলো রাখার একটা গর্ত। সেখানে কুপিটাকে বসিয়ে দিল ফুল্লরা।

—বাবুর একা থাকতে অভ্যেস আছে তো? হঠাৎ প্রশ্ন করল। চোখে কৌতুক।

—আজ্ঞে! চমকে উঠেছিল শিবু।

—ওমা গো, 'আজ্ঞে'টা আবার কি জিনিস? ওসব তো কলকেতার লোকেরাই বলে জানতুম। মিটিমিটি হেসে ওঠে ফুল্লরা।

—না মানে, শিবু কেমন ঘামতে শুরু করে। মানে, হ্যাঁ, খুব অভ্যেস আছে আমার, একাই তো এতকাল থেকেছি।

—বিয়ে-থা হয় নি বুঝি?

শিবুর গলার স্বর নরম হয়ে এল, হয়েছে।

ফুল্লরার চোখ ঝলসে উঠল, ওমা, ঘরে তাহলে বউ আছে বাবুর। বিছানার একপাশে বসে পড়ল ফুল্লরা, কেমন আদুরে-আদুরে ভঙ্গি, নিয়ে এলে না কেন গো? দেখতাম।

শিবু দরজার কাছে এগিয়ে বাইরের দিকে তাকায়, পালাতে

পারলে বাঁচা যায়। কি কুক্ষণেই এখানে এসে শোবার জায়গা খুঁজেছিলাম।

আবার একটা বিদ্যুৎ চমকাল। চোখমুখ ঝলসে উঠল শিবুর।

—বউকে বুঝি চন্দনতলাতেই রেখে এলে? তোমাকে আসতে দিলে?

আবার খাটের কাছে এগোয় শিবু, একটু একা থাকতে পারলে স্বস্তি পাওয়া যেত। কিন্তু অভদ্রতাই বা করে কি করে। বলল, কাজে বেরিয়েছি। বেড়াতে যদি বেরুতাম তা হলে নিয়ে আসতাম।

পা দোলাতে শুরু করে ফুল্লরা। অনেক সময় কাজ আর বেড়ান একসঙ্গেই হয়। বউ বুঝি দেখতে ভাল নয়?

শিবুর অস্বস্তি আরো বাড়ে। কী বেয়াড়া-বেয়াড়া প্রশ্ন রে বাবা। গায়ে যেন চাবুক বসিয়ে দিচ্ছে। বলল, তা কেন।

ফুল্লরার পা দুলুনি থেমে গেল, তবে বউ ছাড়া বাড়ির বাইরে থাকতে কষ্ট হয় না?

শিবু কুপিটার দিকে তাকাল, না। কষ্ট কী।

—ওমা কষ্ট নেই। কি জানি বাপু, পুরুষ মানুষের ব্যাপারই বুঝি না।

শিবু চুপ করে থাকে। ফুল্লরাও কেমন স্তব্ধ হয়ে যায়। আবার একটা বিদ্যুৎ চমকায়।

—কি হল? দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এ বিছানায় শুতে কষ্ট হবে না তো? হাতের কাছে যা পেয়েছি তাই দিয়ে করে ফেললাম। একটু মানিয়ে নিও বাবু।

শিবু এবার আড়ষ্টভাবে বিছানায় বসে।

—আর রাতে যদি কিছু দরকার হয় লজ্জা না করে ডেকো। খেয়ে এসেছ তো?

ক্ষিধেটা অসম্ভব চাড়িয়ে বসেছিল। তবু মুখ ফুটে খাওয়ার কথা বলতে পারে না শিবু। চুপ করে থাকে।

—বুঝেছি, সমিতির কাজে নাওয়া-খাওয়া সব মাথায় উঠেছে।

শিবু হঠাৎই আবার সম্বিৎ ফিরে পেল, না না, খেয়ে এসেছি। চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হল আবার। বেশিক্ষণ তাকান যায় না, মেয়েদের চোখে এমনিতেই বেশিক্ষণ তাকাতে পারে না শিবু।

এমন সময় ও-ঘর থেকে মধুবাবুর গলা, কি গো ফুল্ল, তোমার হল ?

ফুল্লরা গলা তুলে পালটা দিল, তুমি ঘুমোও দেখি, আমি আসছি।

—আপনি যান। শিবু যেন সুযোগ পেয়ে যায় ওকে যেতে বলার।

—ঠিক আছে, দরজাটা তাহলে বন্ধ করো না। কেন ডাকছে দেখে আমি এক্ষুণি আবার ফিরে আসছি। অন্ধকারে চকিতেই দরজার বাইরে বেরিয়ে গেল ফুল্লরা।

ঘটনাটা এমন দ্রুত ঘটল যে শিবু পূর্বাপর ভেবে পেল না। পাথরের মতো নিরেট হয়ে গেল শিবু। দরজা বন্ধ করব না কেন! ও আবার আসবে কেন! ও কী আবার এসে ড্যাবড্যাব করে তাকাবে, কেবল দেখবে! বসে বসে আবার ঘামতে শুরু করে শিবু। কী ফ্যাচাংয়েই পড়া গেল দেখছি।

কুকুরটা আবার চেঁচাতে শুরু করেছে। কেমন বিদঘুটে চেঁচায় রে বাবা! অন্ধকারে কিছু ছায়া-ফায়া দেখে হয়তো ভয় পেয়েছে। রাতের অন্ধকারে গাছের ছায়া অশরীরী আত্মা হয়ে অনেক সময় ভয় দেখায়। কুকুর তো কোন ছার, মানুষও ভয় পেয়ে ভিরমি খায়।

শিবু খাট থেকে নেমে আবার একবার দরজার কাছে আসে। আকাশ অসম্ভব থমথমে। মেঘের পরিমাণ কিছুই বোঝার উপায় নেই। তাছাড়া বাতাসও কেমন স্তব্ধ হয়ে আছে। খুব শীগগীর একটা কিছু যেন ঘটবে।

বিদ্যুৎ ঝলসাতেই চোখে পড়ল উঠোনের বাঁ কোণে একটা বাঁশঝাড়, ঝাড়টা পেরুলেই ফাঁকা মাঠ। এ মাঠে কোনদিন চাষ

হয় না। মাঠ ছাড়িয়ে আরো দূরে তাকালে নদীর বাউণ্ডারিটাকে এখন আর আলাদা করে চেনার উপায় নেই।

মধুবাবুর ঘরের দিকে তাকায় ও, দরজাটা খোলাই রয়েছে, কিন্তু কোন সাড়াশব্দ নেই।

আবার খাটের কাছে সরে আসে শিবু। দরজাটা বন্ধ করে দেওয়ার কথা মনে এলেও পারল না। সব কাজই মানুষ নিজের ইচ্ছায় করতে পারে না। কখনো কখনো অদৃশ্য কোন শক্তি মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। শিবুর দেহে সেই রকম এক অদৃশ্য শক্তি যেন ভর করে বসেছে।

কুকুরটা চেঁচাতে চেঁচাতে আবার মাঠের দিকে ছুটে গেল। আর এ সময় আবার চমকে ওঠে শিবু। অন্ধকারেব ভেতর থেকেই হঠাৎ আবার ফুল্লরা এসে হাজির।

—কি গো বাবুমশাই, কার ধ্যান করছ? তোমার বউয়ের নামটা বললে না তো?

শিবু দেখল, ফুল্লবার শাড়ির আঁচলটা কোমরে গোঁজা। হাতে এক ডালা মুড়ি।

—ও কি হবে? শিবু মুড়িব দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়। মুড়ির ওপর ছড়িয়ে দেওয়া নারকেলের টুকরো, কয়েক ঢেলা গুড়।

—কি হবে মানে? এখন আর ভাত-ফাত রাঁধতে পারব না বাপু, এই মুড়িই চিবিয়ে নাও। কপালে তোমার ভাত নেই কি করব!

শিবুর কি হল কে জানে, পূর্ব কথার জের টানল, বললাম তো খেয়ে এসেছি।

মুড়ির পাত্রটা বিছানার ওপর রাখে ফুল্লরা। তারপর হঠাৎ একেবারে গায়-গায় লেগে আসে শিবুর, আমাকে ছুঁয়ে বল দেখি, খেয়ে এসেছ?

শিবু এবার কেমন গুটিয়ে যায়। ধাঁ ধাঁ করে ওর দেহের ভেতরকার বারুদে যেন বিস্ফোরণ ঘটে। মেয়েদের অসাধ্য বলতে কিছুই নেই।

—না মানে।

—আবার 'আজ্ঞে' বলবে বুঝি? খিলখিল করে হেসে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে ফুল্লরা, নাও বাপু, তাড়াতাড়ি খেয়ে এবার আমাকে ছাড় দেখি। রাত হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া বাড়িতে অতিথি এসে না খেয়ে থাকলে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়। সেই কথা ভেবেই না হয় খাও।

অসহায় শিবু মুড়ির ডালা এগিয়ে নিল। এটাই এখন বাঁচার পথ।

ফুল্লরা বসে পড়ল খাটের পাশে, নাম বললে না তো?

মুড়ি চিবোতে চিবোতে শিবু শুধাল, কার নাম?

—কার আবার, যার কথা জানতে চাইছি?

শিবু মুড়ির দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই বলল, পুষ্প।

—পুষ্প। বাহ্ বেশ নাম তো! মিষ্টি গন্ধ মাখানো নাম। আর এক ধাপ এগিয়ে বসল ফুল্লরা, তোমাদের ছেলেমেয়ে?

শিবু চোখ তুলল না, পারল না। বলল, এখনো হয় নি, হবে।

—ও মাগো, তাই নাকি, বউ তাহলে—আর তুমি ওকে একা রেখে বেরিয়ে পড়েছ দেশের কাজ করতে?

শিবু বলল, চার পাঁচ দিনের মধ্যে কিছু হবে না।

—তাই বুঝি? বাবুর তো দেখছি টনটনে জ্ঞান। কবে হবে?

—এখনো সময় হয় নি, সময় হলেই হবে।

আবার মধুবাবুর গলা পাওয়া গেল, ও ফুল্ল, ফুল্ল গো, তোমার হল? রাত ভোর হয়ে এল যে। ছেলেটাকে ঘুমুতে দেবে না!

—শোন কথা। সারারাত এই এক ব্যামো। নিজে তো ঘুমুবেই না, অন্যকেও ঘুমুতে দেবে না।

—যান না, শুনে আসুন, কি বলছে।

—কী আবার বলবে! সারারাত বসে বসে কেবল গা-হাত-পা টিপতে হবে, আচ্ছা তুমিই বল বাপু, গায়ে কি আছে যে টিপব। ভাবলাম তোমার সঙ্গে বসে একটু গল্প করব, তা ওর সইলে তো!

শিবু মুড়ি চিবোন বন্ধ রাখে।

—আসলে কি জান, সারাদিন একটা লোক পাই না যে কথা বলি। একা থেকে থেকে কেমন যেন হাঁপ ধরে যায়।

—কেন, বেরন না কেন ?

—ওরে বাবা, বুড়োর রাগ জান না তো !

—ফুল্ল, ও ফুল্ল…

—যাই, চেঁচিয়ে উত্তর করল ফুল্লরা। তারপর শিবুর দিকে তাকিয়ে অভিভাবকের মতো বলল, এই বাবু, রাতে কিছু যদি দরকার হয়, ডেকো কিন্তু। নতুন বলে আবার যেন লজ্জা করো না।

শিবু মাথা নাড়ে, ঠিক আছে।

—আর মুড়িটুকু সব খেয়ে ফেলবে। বুঝলে, লজ্জা করে না খেলে তুমিই কষ্ট পাবে।

শিবু এবারও মাথা নাড়ে, ঠিক আছে। আপাতত একটু একা থাকতে পারলে যেন বেঁচে যায় শিবু।

ফুল্লরা আর দাঁড়াল না। দরজা খুলল, তারপর বিদ্যুতের মতো একবাব ঝলসে উঠেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

দুই

ফুল্লরার চলে যাওয়ার ভঙ্গিটা কেমন যেন অদ্ভুত লাগে শিবুর। দেহের কাঠামো জুড়ে বাঁধভাঙ্গা যৌবন। চলায় বলায় তা উপচে পড়াই স্বাভাবিক। কিন্তু শিবু বুঝতে পারে না, মধুবাবুর মতো এক বৃদ্ধ কেমন করে এই মহিলাটিকে নিজের শেষ জীবনের সঙ্গী করার জন্য বেছে নিলেন। নাকি টাকার লোভেই মধুবাবুকে জালে ফেলেছে মহিলাটি। কথাটা ভাবতেই কেমন যেন মুষড়ে পড়ে শিবু।

এরপর আর মুড়ি চিবোন চলে না। গলা বুজে আসে। শিবু মুড়ির ডালাটা সরিয়ে রাখে। ওপাশে ঢাকা দেওয়া জলের গ্লাস রয়েছে, হাতে তুলে নেয়। এমন সময় হঠাৎ জানলাটা দড়াম করে একবার খুলে গিয়েই আবার বন্ধ হয়ে যায়। শিবু বুঝল, ঝড়ের দাপট শুরু হয়েছে। এতক্ষণ থমকে-থাকা বাতাসটা এবার পাগলা হতে শুরু করেছে।

হ্যাঁ, ঝড়ই। দড়াম করে দরজার একটা পাল্লাও বন্ধ হল। কুপিটা আর একটু হলেই নিভে যেত। শিবু বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে দরজায় শরীরটাকে চেপে ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

প্রচণ্ডভাবে বাতাস ছুটছে বাইরে। ঘরের ওপরে খড়ের ছাউনি। ছাউনির ওপর বাতাসের ধাক্কা লাগছে, শব্দেই তা বুঝতে পারল শিবু। দিন দু-তিন এরকম চললে আর দেখতে হবে না। সম্মেলন নির্ঘাৎ পেছুতে হবে, এত কষ্ট করে এখানে আসাটাই তা হলে ওর মিছে হবে।

দরজায় খিল তুলে দিয়ে শিবু জানলার ধারে এগিয়ে আসে। জানলার পাল্লাটা জোর করে ধরে একটু ফাঁক করল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমক। পেছনে সত্যি সত্যি একটা গোয়াল আর সেই গোয়ালে

গোটা চারেক গরু দেখতে পেল শিবু। গরুগুলি উঠে গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে সর্বনাশা কিছু লুকিয়ে থাকলে ওরাই যেন সবার আগে টের পায়।

খাটালের ওপাশে আরো সব বাড়িঘর। ঠাসা অন্ধকারে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িতে কোন লোকজন আছে বলে মনে হল না।

বাতাসের কী শব্দ রে বাবা! জানলাটা বন্ধ করে দিল শিবু। হঠাৎ চমকে উঠল, খাটের নিচ থেকে একটা বেড়াল বেরিয়ে এসেছে। যাহ্ বাবা, এতক্ষণ এটা কোথায় ছিল?

বেড়ালটা এগিয়ে এসে শিবুর পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। অচেনা লোক দেখেও ভয় নেই যেন।

গায়ে হাত রাখতেই বেড়ালটা করুণ গলায় ককিয়ে উঠে ল্যাজ দিয়ে শিবুর গা বুলিয়ে দিল।

শিবু ওকে কোলে তুলে নিল, কি হয়েছে রে? ভয় পেয়েছিস?

বেড়ালটা শিবুর সব কথাই যেন বুঝতে পারছে, অদ্ভুত শব্দ করে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল শিবুকে।

কৌতুকে তাকিয়ে থাকে শিবু। এমন করছে কেন বেড়ালটা! তবে কি বাইরে সাংঘাতিক কিছু ঘটছে! খাটের ওপর উঠে বসে শিবু। আর এ সময় আবার পুষ্পর কথা মনে পড়ল। চন্দনতলাতেও কি এখন এই রকম ঝড় উঠেছে! বাড়ির পুষিটাও কি ঝড়ের ভয়ে পুষ্পর গায়ে গা লাগিয়ে বসে আছে! পুষ্প কি ভাবছে এখন! পুষ্প কি ভাবছে, শিবু ফাঁকা মাঠের মধ্যে তুফানে একা পড়ে গেছে! না পুষ্প, না। আমি ভাল আছি। আমি মধুবাবুর এই ঘরে এখন নিশ্চিন্তে আছি। ঝড়-তুফানে আমার ভয় নেই পুষ্প, কিন্তু ভয় যে কারণে সে কথা তোমাকে সব বলব। আমি কিছু লুকোব না।

এ সময় প্রচণ্ড শব্দ করে একটা বাজ পড়তেই বেড়ালটা লাফিয়ে বিছানায় উঠে বসল। বাজের শব্দে কানের পর্দা ফেটে যাবার

মতো। শিবুও ঘাবড়ে গিয়েছিল। হাত পঞ্চাশেকের মধ্যেই যেন পড়েছে। কার ঘাড়ে পড়ল কে জানে। আর একটু হলে তো বাজটা এ ঘরের চালেও পড়তে পারত। তাহলে ভেজা খড়েও দাউদাউ করে আগুন ধরে যেত। তাহলে এই খাটের ওপর পোড়া ছাই হয়ে পড়ে থাকত শিবু। আর তাহলে পুষ্পর কি হতো।

পুষ্পর গর্ভে যে শিশুটি ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে, সে তো বাবার মুখ দেখতে পেত না। সে পৃথিবীটাকে কিভাবে চিনত তাহলে। কে তাকে হাত ধরে সব কিছু শেখাত। সারা গা শিরশির করে উঠল শিবুর।

স্তব্ধ হয়ে পা গুটিয়ে বিছানার ওপর বসে পড়ল। এ সময় পুষ্পর কাছে না থাকায় মেজাজটাই কেমন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

লক্ষ্য করল, আশেপাশে কোন বাড়ি থেকে যেন শাঁখ বেজে উঠেছে। প্রচণ্ড বৃষ্টিও শুরু হয়েছে ; হ্যাঁ, বৃষ্টিই। কুকুরটা এই বৃষ্টি মাথায় করেই ছুটোছুটি করছে উঠোনে। ঘরের দরজাটা নড়বড় করে নড়ছে। ঝড়ের দমকায় ভেঙ্গে যাবে না তো। সারা দেহে আবার কেমন শিহরণ খেলে গেল ওর। দরজাটা যদি সত্যি সত্যি ভেঙ্গে যায়, ঘরের এই খড়ের চালাটাকে যদি ভয়ঙ্কর বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়, কী হবে তাহলে। কে জানে, এই বাতাসে এরই মধ্যে কারো কারো সর্বনাশ হয়ে গেল কিনা।

শিবু বেশিক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকতে পারল না। এই ঝড়ের সময় ওর পুষ্পর পাশেই থাকা উচিত ছিল। পুষ্প যদি ভয় পায়, সেই ভয়ের রেশ কী তবে সন্তানের গায়েও লেগে যেতে পারে। গা-হাত-পা আবার কেমন শিরশির করে ওঠে ওর।

আবার জানলার কাছে এগিয়ে আসে শিবু। জানলাটাকে কেউ যেন বাইরে থেকে ঝাঁকাচ্ছে। অল্প একটু ফাঁক করে বাইরেটা দেখবার চেষ্টা করে শিবু। কিন্তু বরফের মতো ঠাণ্ডা এক ঝলক খ্যাপা বাতাস ছাড়া কিছুই নেই। গায়ের জোরে ঠেলে জানলাটাকে আবার বন্ধ করে দেয় ও।

ফাঁকা মাঠের ধারে বাড়ি বলেই কী বাতাসের দমকাটা এ-রকম লাগছে। নাকি সত্যি সত্যি মহাপ্রলয় শুরু হয়ে গেছে। লক্ষ্য করল, বেড়ালটা বালশের কাছে হুমড়ি খেয়ে বসে পড়েছে। বসে গুটিয়ে কেমন এইটুকু হয়ে উঠেছে।

—দূর পাগল, অত ভয় কী। এখনি থেমে যাবে। যা, ওপাশে যা।

বেড়ালটা নড়ল না।

গোয়ালের পাশে কি যেন একটা হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল। কিছুই ঠাহর করা গেল না, কি পড়ল। ঘরের খাটটাও সেই পতনের শব্দে দুলে উঠল। দুলে উঠল, না, মনের ভুল। জানলার দিকে তাকিয়ে থাকে শিবু।

দরজাটা আলগা হয়ে যাচ্ছে কী। দু-হাতে কেউ যেন দরজার ওপাশ থেকে দড়াম দড়াম করে আঘাত করছে। বাতাসের গায়ে এত শক্তি! শিঠিয়ে কেমন কাঠ হয়ে তাকিয়ে থাকে শিবু। ওর বোধ-বুদ্ধি সব যেন লোপ পেতে শুরু কবেছে।

নাকি সত্যি সত্যি কেউ বাইরে থেকে দরজাটা ধাক্কাচ্ছে। চমকে উঠল শিবু। ফুল্লরা নয় তো! কিন্তু এই ঝড়ের মধ্যে মধুবাবুকে ছেড়ে ফুল্লরা এখানে আসবে কেন! কি দরকার!

নাহ, দরজাটা যেন ভেঙেই যাবে। শিবুকে আবার উঠতে হল। কিন্তু খুলতে সাহস হয় না। বাতাসের ঝাপটায় ঘরের ভেতরটা হয়তো তছনছ হয়ে যেতে পারে। দরজার পাল্লায় কান পাতে শিবু। আর এ-সময় ওর সমস্ত শিরা-উপশিরায় আবার প্রচণ্ড শিহরণ খেলে গেল। বুঝতে পারল, ফুল্লরাই আবার ফিরে এসেছে। হ্যাঁ, দরজার বাইরে থেকে ফুল্লরাই চেঁচাচ্ছে। কিন্তু কি যে বলছে বোঝা যাচ্ছে না।

এক মুহূর্ত কি ভাবল শিবু, পরে চেঁচিয়ে বলল, দাঁড়ান খুলছি।

দরজার খিল খুলতেই বাইরের হিংস্র তুফান থাবা বসিয়ে ঝাঁপিয়ে

পড়ল শিবুর ওপর। দরজার পাল্লাটা দড়াম করে ওকে আঘাত করল। সামলাতে না পেরে ঘুরে পড়ল শিবু। আর সেই সঙ্গে আলোটাও গেল নিভে। নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে গেল ঘরটা। সামান্য একটা তেলের কুপির সাধ্য কী, আরো জ্বলে।

—কই গো বাবু, তুমি কোথায়? ঘরে ঢুকে আর্ত চিৎকার করে দরজার পাল্লার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল ফুল্লরা। দরজাটা বন্ধ কর গো বাবু, ও শিবনাথবাবু।

শিবু উঠে দাঁড়ায়। এগোতে গিয়ে ফুল্লরার গায়ের ওপরই হুমড়ি খেয়ে পড়ে লাফিয়ে ওঠে। এক তাল মাংসপিণ্ডে হাতে লাগল যেন।

—দরজা বন্ধ কর গো। আমি কি একা পারি। ও বাবু।

শিবু এবার সাবধানে দরজার পাল্লায় ঝুঁকে পড়ে। তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে পাল্লাদুটোকে আবার জুড়ে দেয়। খিল তুলে দিল ফুল্লরা।

—বাব্বা, দরজা না খুললে ঝড় আমাকে উড়িয়েই নিয়ে যেত।

শিবু অন্ধকারে একটু সরে দাঁড়ায়। খাটের কাছাকাছি এগিয়ে আসে, কিন্তু কথা বলে না। কনুইয়ের পাশটা বোধহয় একটু কেটেছে। জ্বালা-জ্বালা শুরু হয়েছে। কেটেছে কিনা কে জানে।

—ও বাবু? কোথায় গো তুমি? পেছনের বুড়ো তেঁতুল গাছটাকে ঝড়ে উপড়ে ফেলেছে। গোয়ালের ওপরই পড়েছে বোধহয়। গরুগুলোর দড়ি খুলে দিতে পারলে ভাল হত।

—মেসোমশায় কোথায়? গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করে শিবু।

ফুল্লরা বোধহয় তখনো দরজার পাল্লাতেই পিঠ লাগিয়ে রেখেছে, বলল, ঘুমিয়ে পড়েছে। তোমার কাছে দেশলাই নেই? বিড়ি সিগারেট খাও না?

—না। উত্তর করল শিবু। ঘুমিয়ে পড়েছে কি রকম? এই ঝড়ের মধ্যে কেউ ঘুমুতে পারে।

—পারে গো, পারে। ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়েছি।

—ঘুমের ওষুধ। ঘুমের ওষুধ খায় নাকি ?

—খায় না মানে, না খেলে ঘুম হয় বুঝি! তবে, আজ আমি ওকে ডবল ডোজ খাইয়ে দিয়েছি। ভোরের আগে জাগবে না।

শিবুর সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। কী সাংঘাতিক মেয়ে রে বাবা। ডবল ডোজ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছে মধুবাবুকে। দরকার হলে তো লোকটাকে মেরেও ফেলতে পারে। শিবু আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ আবার কথা নেই। বিষধর একটা সাপ যেন ঘরের ভিতর ঢুকে বসেছে, শিবুব শিঁঠিয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। তাছাড়া বাইরে যে কী হচ্ছে এখন কে বলবে। দবজা আর জানলাটা এখনো থরথর করে কাঁপছে। ভালয়-ভালয় রাতটা পার হলে বাঁচা যায়।

—কই গো বাবু, তুমি কোথায় ?

শিবু আবার চমকে ওঠে, ফুল্লবা খাটের পাশেই এগিয়ে এসেছে নাকি! উত্তর করে না শিবু।

—বোবা হয়ে গেলে নাকি গো বাবু? তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমরাই যদি ভয় পাও, আমরা যাই কোথায়!

শিবু বলল, ভয় না। এই তুফানের মধ্যে মেসোমশাইকে অত ওষুধ খাইয়ে রাখা কি উচিত হল আপনার ?

—আমিও তো সেই কথাই বলেছিলাম, শুনলে তো! ঘুমের ওষুধ খাওয়া একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে ওর। বললে শোনে না। তুমি বাবু কাল ওকে বারণ করে দিও তো।

শিবু চুপ করে থাকে, কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে এখন আর বোঝার উপায় নেই।

কুকুরটা অনেকক্ষণ ধরে চুপ করেছিল, এখনো বাড়ির উঠোনেই আছে, না অন্য কোথাও চলে গেল! বেড়ালটা তো বিছানার ওপরই ছিল, কোথায় গেল!

ফুল্লরা খাটেই উঠে বসেছে। টের পেল শিবু। খাটটা নড়ে উঠল। শিবু বিরক্তি মিশিয়ে বলল, এই ঝড়ের মধ্যে মেসোমশাইকে আপনার একা ফেলে রাখা উচিত হয় নি। আপনি বরং ও-ঘরে যান।

—ওমা, সে কী কথা। একটা মড়া আগলে বসে থাকার জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছ? ফুল্লরার গলায় যেন কৌতুক ঝরে পড়ছে। আশ্চর্য!

শিবু কেমন থ' হয়ে গেল। না, তা-না, তবে আমরা দুজনেই একসঙ্গে ও-ঘরে যেতে পারি। ওকে একা এভাবে ফেলে রাখা উচিত নয় আমাদের।

অনেক দূরে আবার কোথাও বাজ পড়ল একটা। শব্দটা কেমন গড়াতে লাগল। ঘরের বাইরে কি একটা ভারী জিনিস যেন গড়াতে গড়াতে চলে যাচ্ছে। বাতাসটা কী আরো বাড়ল!

—তুমি কোথায় গো বাবু? এতই যদি তোমার বুড়োর জন্যে ভাবনা, যাও না, দরজা খুলে দেখে এসো না, কি হচ্ছে বাইরে।

—কি হচ্ছে বাইরে? গলার স্বরটা কেমন কুঁকড়ে এল শিবুর। হাত-পা আবার কেমন শিঠিয়ে এল।

খাটের ওপর টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল নাকি ফুল্লরা। কী সাংঘাতিক! ভয়ে উত্তেজনায় আবার বোবা হয়ে গেল শিবু।

—কি যে হচ্ছে তা সকালেই টের পাবে। অবশ্য সকাল পর্যন্ত যদি আমরা বেঁচে থাকি।

শিবুর চোয়ালদুটো ঝুলে পড়ল, তবু গলার স্বর কঠিন করে বলল, আমি বেরুব। তারপর খাটের পাশ থেকে লাফিয়ে উঠে পড়ল।

ঘরময় বীভৎস অন্ধকার। এমন নিরেট অন্ধকারের অভিজ্ঞতা আর কখনো হয়েছে কিনা মনে করতে পারল না শিবু।

ধড়ফড় করে এবার ফুল্লরাও উঠে বসেছে, টের পেল ও।

—ও বাবু, এ তুফানে দরজা খুলো না গো, দমকাটা কমুক, তারপর না হয়—

ততক্ষণে দরজার কাছে এগিয়ে এসেছে শিবু, কিন্তু দরজায়

হাত দেবার আগেই সাপের মতো ফুল্লরার ছোবল লাগল ওর গায়ে। সারা গা আবার ঝনঝন করে উঠল ওর।

—কি হচ্ছে? বিরক্তিতে ফুল্লরার উদোম হাতটাকে সরিয়ে দিল শিবু।

—পাগলামী করো না তো। বাইরে বেরিয়ে আর এক বিপদ ডেকো না, চন্দনতলায় তোমার বউ আছে। সব ব্যাপারে অত মেজাজ গরম করা ভাল নয়।

শিবুর শরীরটা কেমন অবশ হয়ে এল। হ্যাঁ, সত্যি সত্যি ওর জন্য আর কেউ থাক না থাক, পুষ্প আছে। চুলোয় যাক ওর সম্মেলন, ভোর হলেই ও দেশের দিকে পালাবে।

শিবু টের পেল, ফুল্লরার একটা হাত উঠে এসেছে ওর কাঁধে। এদিকে এসো গো বাবু, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয় এসময়, এদিকে এসো।

—আহ্ কোথায় যাব? শিবু বিরক্তি প্রকাশ করল আবার।

কিন্তু ফুল্লরার কোন গ্রাহ্য নেই। ফুল্লরা ওর হাত ধরে টানল, এসো। ঝড়টা কমুক, একসঙ্গেই আমরা বেরুব।

শিবু কেমন অসহায়ভাবে ফুল্লরার পাশে খাটের ওপর আবার বসে পড়ে। বাইরে ঝড়ের শব্দ। গাছপালা বাড়িঘর সব ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেও শিবু রেহাই পাবে না। তাছাড়া ওর কি দোষ। ও তো আর ফুল্লরাকে ডেকে আনে নি, ও যদি নিজে নিজেই আসে শিবু কি করতে পারে।

স্তব্ধ হয়ে অনেকক্ষণ ফুল্লরার পাশটিতে বসে থাকে শিবু। একসময় মনে হল, আলোটা নিভে গিয়ে ভালই হয়েছে, ফুল্লরার ঐ ড্যাবডেবে চোখের শিকার হতে হচ্ছে না। ঝড়ের দিকে কান পাতে শিবু।

—হ্যাঁ গো বাবু, ভয় কমল? স্থির হয়ে থাকা ফুল্লরা আবার নড়ে উঠেছে।

শিবু উত্তর দেবে না ভেবেছিল, কিন্তু সাহস প্রকাশ করতে গিয়ে বলল, ভয় পাই নি তো। তবে দুশ্চিন্তা হয়েছিল, এখনো তা আছে।

—কিসের দুশ্চিন্তা? শিবুর একটা হাত মুঠোর মধ্যে তুলে নিল ফুল্লরা।

আবার একটা বড় রকমের গাছ-টাছ পড়ল বোধহয়। বেশ দূরে কিছু লোকের চেঁচামেচিও শোনা গেল।

শিবু হাত ছাড়িয়ে নিল, কারা যেন চেঁচাচ্ছে।

—আবার এখনি থেমে যাবে। খাটের ওপর পুরো দেহটাকে তুলে নিয়েছে ফুল্লরা। বলল, আজ রাতেই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। তুমি চেতাবনী বিশ্বাস করো?

চেতাবনী নিয়ে বেশ কিছুকাল ধরেই হৈ চৈ হচ্ছে। চেতাবনীর প্রসঙ্গে শিবুর কৌতুক বাড়ল।

আবার একটা হাত এগিয়ে দিয়ে শিবুকে জড়িয়ে ধরে ফুল্লরা, আমাদের পুর্বপুরুষরা অনেককাল আগেই চেতাবনীর কথা বলে গেছেন জানো না, এই গাইগাছি, গোশিঙা, শিকড়দ, মন্দিরতলা এসব গ্রাম চিরকাল থাকবার নয়, একদিন না একদিন ধংস হবেই। ঝড় তুফানে হোক, ভূমিকম্পে হোক এগুলি মুড়িয়ে যাবেই। আর এ সময় তুমি যে বাবু কী কুক্ষণেই আমাদের মধ্যে এসে পড়লে।

শিবুর রক্তচাপ যেন বাড়ছে। কেন, ভাসবে কেন? কি দোষ করেছে?

—তুমি বাবু পাথর হয়ে বসে আছ, কাছে এসো দেখি। খাটে গড়িয়ে পড়ে ফুল্লরা। এসো, কাছে এসো, সব বলছি।

ঝড়ের তীব্রতা কি আরো বেড়ে যাচ্ছে। শিবু নিজের শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল। ফুল্লরার আকর্ষণ আর ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে নিজেকে সমর্পণ করে দিল শিবু।

বাইরে বাতাসের দাপট দরজার ওপর এখনো আছড়ে পড়ছে।

পাল্লাদুটো থরথর করে কাঁপছে, ভেঙে ফেলবে না তো! শিবু কান পাতল, না, বাইরে কিছু আগে যে লোকগুলি চিৎকার করে উঠেছিল তাদেরও আর সাড়াশব্দ নেই। সবাইকে কী ঝড়ের বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গেল!

—এই তো বাবু, ভাল মানুষ। ভালভাবে শোও। যতক্ষণ না ঝড় থামে, সব শান্ত হয়, শুয়ে থাক দেখি।

শিবুব বুকের ওপর একটা হাত তুলে দিল ফুল্লরা। বাহুর একপ্রান্তে ফুল্লার বুকের স্পর্শ পেল শিবু। দেহের ভেতরেও কী ঝড় শুরু হয়ে গেল নাকি ওদের।

—গ্রামগুলি কি দোষ করেছে, বললেন না তো? শিবু যেন ওর এই পরনারীর সঙ্গে শুয়ে থাকা অবস্থাটাকে মন থেকে সরাতে চাইছে। কিন্তু কানের পাশে ঝাঁ-ঝাঁ করছে ওর।

—পাপে ডুবে গেছে সবাই। উত্তর করল ফুল্লরা। এত পাপ সইবেন কেন ভগবান?

—আপনি পাপপুণ্য বিশ্বাস করেন? শিবু দেহটাকে অনড় করে রাখার চেষ্টা করছে। মধুবাবুর কেপটের মুখেও পাপপুণ্যের কথা! কেমন অদ্ভুত লাগছে ওর।

ফুল্লরার ঘন নিশ্বাস লাগছে। নিশ্বাসে যেন আগুনের হলকা মিশে আছে। শিবু কি যে করবে ভেবে পায় না।

—ওমা, সে কী কথা! পাপপুণ্য বিশ্বাস করব না। আমি মানুষ নই বুঝি? রাতদিন চোখের সামনে দেখছি ধিঙ্গি মেয়েগুলি কি সব অপকর্ম করছে। লজ্জায় মরে যাই।

শিবু স্তব্ধ। শুনতে পেল কিনা কে জানে।

—আর সবচেয়ে মজার জিনিস কি জান গো বাবু, কোন লুকো-ছাপা নেই ওদের; ঘেন্না ঘেন্না!

—আমাকে যে এভাবে জড়িয়ে ধরেছেন, ঘেন্না হয় না? কথাটা বলেই কেমন অপরাধ বোধ করে শিবু।

কিন্তু ততক্ষণে শিবুকে আরো কাছে টেনে নিয়ে ঘনিষ্ঠ হয় ফুল্লরা।

—না গো। এতে কোন দোষ নেই।

—কেন ?

—অত জানি না।

—কি জানেন না ?

—ও কথা না হয় পরে হবে। বেশ তো তুফানের গল্প হচ্ছিল, চেতাবনীর গল্প।

বড় মায়া হয় শিবুর। তুফান যেন সংহারমূর্তি নিয়ে ঘরের মধ্যেই প্রবেশ করেছে। এ তুফানের হাত থেকে এত সহজে কেউ রক্ষা পায় না। শিবু বুঝতে পারল ওরাও পাবে না। অতএব নিজেকে আর ধরে রাখে না শিবু। ঝড়ের হাতেই সমর্পণ করে দিল নিজেকে।

অবশেষে অসংখ্য আলোর কণায় ঘরখানা ভরে গেল। অবয়বহীন বিন্দু বিন্দু নিরুত্তাপ আলোর ফুলকি। শিবু সেই আলোর দিকে শূন্যদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকল। বাইরে এসময় বাতাসের দাপাদাপি অনেক কমেছে বলে মনে হল ওর। কিন্তু অঝোর বৃষ্টির শব্দ এখনো শোনা যাচ্ছে। কে জানে, বাইরে হাঁটু পরিমাণ জল দাঁড়িয়ে গেছে কিনা।

এ অবস্থায় সম্মেলন কিছুতেই চলতে পারে না। গাঁয়ের গরিব চাষীদের কার কি ক্ষতি হয়েছে কে জানে। যে যার নিজের ঘর সামলাবে না, সম্মেলনে আসবে। শিবু ঠিক করল, কেউ কিছু বলুক আর নাই বলুক, এই সম্মেলন পিছিয়ে দেওয়ার কথাই ও বলবে। ওর কথা কেউ শুনুক আর নাই শুনুক, সম্মেলন যদি হয়ও শিবু কাল আর এখানে থাকবে না। কালই ও চন্দনতলার দিকে রওনা হবে। পুষ্পর জন্য বুকটা কেমন টন-টন করছে ওর। পুষ্পকে

আর একবার চোখের দেখা না দেখে কোন কাজই ওর দ্বারা আর সম্ভব নয়।

কনুইয়ের কাছটা আবার জ্বালা-জ্বালা করছে। মাঝখানে কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত কিছু যেন ও ভুলে গিয়েছিল। হঠাৎ হাতটা নাড়তে গিয়ে আবার মনে পড়ল, তখন দরজা খুলতে গিয়ে ঝড়ের ধাক্কায় ও পড়ে গিয়েছিল। আর কনুইয়ের কাছে ঘষে গিয়ে চোট লেগেছিল ওর। অন্ধকারে চোটের পরিমাণটা তখন বোঝা যায় নি। কিন্তু এখন আবার জ্বালাভাবটা ফিরে এসেছে। হাত বুলিয়ে বোঝার চেষ্টা করে শিবু। হ্যাঁ, খানিকটা ছড়ে গেছে। রক্ত চটচট করছে জায়গাটায়।

হাতটাকে বিছানার ওপর চেপে ধরে শিবু। টের পেল, ফুল্লরা আবার ওর পাশটিতে উঠে এসেছে।

—কি হল ? অসহায়ভাবে প্রশ্ন করে শিবু।

ফুল্লরা খাট থেকে নামবার জন্য শিবুকে ডিঙোয়। শেষবারের মতো শিবুর গালে গাল বিছিয়ে চুলের গভীরে আঙুল ডুবিয়ে একটু আদর করে। তারপর নেমে পড়ল খাট থেকে।

—দাঁড়াও বাবু, একবার দেখে আসি, বুড়োটা আছে না গেল।

শিবু নড়ল না। আলোর কণাগুলি উবে গিয়ে ঘরটা আবার জমাট অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। মধুসূদনবাবুর জন্য একসময় সত্যি সত্যি বুকটা ওর টন-টন করে ওঠে। বেচারা মানুষের জীবনে কত কিছুই না ঘটে।

—কই গো বাবু, দরজাটা বন্ধ করবে এসো। সারাটা রাত তো ঘুম হয় নি, এবার একটু ঘুমোও।

শিবু উঠল।

দরজার পাল্লা খুলেছে ফুল্লরা। না, ঝড় থেমেছে। বাতাসের সেই দাপাদাপি এখন অনেক কম। কিন্তু এখনো বৃষ্টি পড়ছে নাকি ! শিবু দরজার কাছে এগিয়ে আসে।

—দরজাটা বন্ধ কর দেখি। ভোর না হলে বেরিয়ো না, বুঝেছ ?

শিবু দরজার পাল্লায় হাত দিয়ে দাঁড়ায়, মাথা নাড়ে, বুঝেছে।

শাড়ির আঁচলটা মাথার ওপর তুলে সোমত্থ একটা বউ সেজে ফুল্লরা উঠোন ডিঙিয়ে মধুসূদনবাবুর ঘরের দিকে চলে গেল।

ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে শিবু। বাতাস যে এত তাড়াতাড়ি থেমে যাবে ভাবা যায় নি। সমস্ত আকাশটা এখনো ভীষণ থমথমে। ভীষণ ভারি।

হঠাৎ ও চমকে উঠল, উঠোনের ওপর কী ওটা! কোথথেকে একটা টিনের চাল উড়ে এসেছে। হায় সর্বনাশ, কোথথেকে এল!

দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেল শিবু। ধীরে ধীরে দাওয়ার শেষ-প্রান্তে এসে দাঁড়াল।

না, বৃষ্টিটা পুরোপুরি থামে নি। এখনো জলের কণা ঝুরঝুর করে উড়ে বেড়াচ্ছে। একঝলক জলকণা ওর গায়ে লাগতেই দু-পা আবার পিছিয়ে এল ও। আস্ত একটা টিন উড়িয়ে আনা কম কথা নয়। চারপাশে আরো কত ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে কে জানে!

আবার ব্যাঙ ডাকতে শুরু করেছে। শিবু বুঝল, আবার নামবে। আবার ভাসাবে পৃথিবীটাকে।

দূরের মাঠের দিকে তাকাল শিবু। অন্ধকারে ভাল করে ঠাহর হয় না। কিন্তু, আরো দূরে বাউণ্ডারির ওপর কী ওগুলো! কয়েকটা লণ্ঠন জ্বলছে দেখতে পেল ও। বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছে ওখানে। এই বৃষ্টি মাথায় করে কি করছে লোকগুলি। কী ঘটতে পারে ওখানে! বাউণ্ডারির ওপারে তো মাত্র চার পাঁচ রশি চওড়া একটা নদী। নদীর ওপারে তেমন কোন জনপদ নেই, কেবল জঙ্গল। ওদিকে মানুষের বড় একটা যাতায়াতও নেই। কী ঘটতে পারে তাহলে!

থ হয়ে অনেকক্ষণ বাউণ্ডারির দিকে তাকিয়ে থাকে শিবু।

এখান থেকে চিৎকার করে হাঁক পাড়লেও লোকগুলি শুনতে পাবে না। আর চিৎকার করাটাও ওর উচিত হবে না। ওপাশে মধুবাবুর ঘর থেকে এখনি আবার বেরিয়ে আসবে ফুল্লরা। আবার হয়তো অভিনয় শুরু করে দেবে। বাপ রে, কিছুই অসাধ্য নেই ওর।

দাওয়ার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকে শিবু। আকাশ চিরে বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে। অন্য কোথাও হয়তো দাপটে বৃষ্টি হচ্ছে।

কিন্তু লোকগুলি কী খুঁজছে ওখানে। কৌতূহল দমাতে পারল না শিবু। কতটুকুই বা পথ, হুট করে একবার দেখে এলে হয়।

এপাশে একবার মধুবাবুর ঘরের দিকে তাকাল, দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে ফুল্লরা। নিশ্চিন্ত। শিবু আর অপেক্ষা করল না। নিজের ঘরের দরজাতেও শেকল তুলে দিল। তারপর ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেই নেমে পড়ল উঠোনে।

ও কী! চমকে দু-পা পিছিয়ে এল ও। কুকুরটা না! এই কুকুরটাই তো তখন চেঁচাচ্ছিল। ইস্, কীভাবে উড়ে আসা টিনের কোণায় গেঁথে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে। গা শিরশির করে উঠল শিবুর।

এগিয়ে এসে পা দিয়ে একটু ঠুকল, না, এ অবস্থায় কেউ বাঁচে না। বড় করুণ দৃশ্য। ঘর থেকে পা বাড়াতেই প্রথম মৃত্যু দেখল শিবু।

তিন

বাউণ্ডারির ওপর তখন অনেক লোক। এত লোক যে বাড়ির দাওয়া থেকে পুরোটা বোঝা সম্ভব ছিল না। কারো কারো হাতে লণ্ঠণ আর লাঠি। পেছল কাদায় শক্ত হয়ে দাঁড়াতে গেলে লাঠির সত্যি সত্যি প্রয়োজন।

চার-পাঁচ হাত উঁচু বাউণ্ডারির ওপর উঠতে গিয়ে একবার পা হড়কাতে হড়কাতে বেঁচে গেল শিবু। কোনক্রমে মাটি খামচে ওপরে উঠে এল, কি হয়েছে দাদা? কি হয়েছে?

সবারই চোখে-মুখে কেমন উত্তেজনা, শিবুকে অনেকে গ্রাহ্যই করল না। কে একজন বিরক্তিতে বলল, কাণা নাকি! নদীর দিকে তাকিয়ে দেখ না, কোথাকার ভূত রে বাবা!

শিবু নদীর দিকে চোখ পাতল। এ কেমন নদী, জলহীন বলে মনে হল ওর। নদীর সমস্ত জল কেউ যেন চুমুক দিয়ে শুষে নিয়েছে। এ রকমও হয় নাকি! শিবুর বুকের ভেতর গুড়গুড় করে কেঁপে উঠল। কিছু একটা যেন ভয়ানকরকম ওলট-পালট হয়ে গেছে প্রকৃতির মধ্যে। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। ঠিক দেখছে তো শিবু, নদীর সমস্ত জল নিঃশেষ হয়ে একটা চামচের খোলের মতো হয়ে আছে। লক্ষ্য করল, নদীর ঢালে অনেক নিচের দিকে একপাল কুকুর চেঁচাচ্ছে। কুকুরগুলি বুঝি বিপদের ব্যাপারে সবার আগে টের পায়। হয়তো ওদের বাড়ির সামনের কুকুরটাও এরকম কিছু টের পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাতেও রেহাই পেল না বেচারা।

—নদীর ওরকম চেহারা কেন গো? আতঙ্কে প্রশ্ন করে শিবু।

লোকটা শিবুর দিকে তাকাল, তুমি কে হে? কোত্থেকে এসে উদয় হলে? চেনা মনে হচ্ছে না তো!

শিবু বিনীতভাবে বলল, আমি ভিনদেশী, গোশিঙার সম্মেলনের জন্য এসেছিলাম।

—ভিনদেশী। লোকটার চোখে কেমন সন্দেহ। ভিনদেশী মানে? কোথায় দেশ?

শিবু বলল, চন্দনতলা, মেদিনীপুরের চন্দনতলা।

লোকটা চন্দনতলা চিনল না। শুধাল, এখানে কোথায় উঠেছ?

এত জেরা ভাল লাগছিল না শিবুর, তবু বলল, মধুবাবুর বাড়ি।

লোকটা আপাদমস্তক একবার দেখে নিল শিবুর। কই, মধুবাবুও, এয়েছে নাকি?

শিবু বলল, না, আমি একাই।

—মধুবাবু বুঝি এখনো ঐ মাগীটাকে নিয়ে শুয়ে আছে। এত সুখ ওর সইলে হয়। এরপর যখন ঘরের মধ্যে বান ঢুকবে তখন দেখব কি করে তোমার মধুবাবু।

মধুবাবুর ওপর লোকটার বোধহয় ঘেন্না আছে। শিবু নাচার। খারাপ লাগল শিবুর। কিন্তু ও কি করতে পারে, ওর কি দোষ। শিবু বিনীতভাবে শুধাল, নদীটা এরকম হল কেন বলুন না?

—তোমার মধুবাবুকে শুধোও গে যাও। যত্ত সব। ।লোকটা মুখ ঝামটা দিয়ে সরে গেল।

শিবু বুঝল, লোকটা অহেতুক চটে গেছে। কিন্তু পায়ে পা লাগিয়ে অহেতুক ঝগড়া বাঁধাতে ইচ্ছে হল না শিবুর, সরে এল। এবার আর নিজের পরিচয় দেবে না ও। মধুবাবু কার কার পাকা-ধানে মই লাগিয়ে রেখেছে, কে জানে।

বাউণ্ডারির ওপর কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক করল শিবু। চারপাশে কেবল জটলা। থোকায় থোকায় মানুষ, আর উত্তেজনা। বাঁধের ওপর থেকে দক্ষিণ দিকটা অনেক দূর অবধি দেখা যায়। কেমন ধোঁয়ার মতো হয়ে আছে ওদিকে। ঐ দক্ষিণ দিকে ঘণ্টাখানেক নৌকো

বাইলেই নাকি বড় নদী, তারপর সাগর। সাগরের কাছাকাছি গ্রাম বলেই বোধহয় লোকগুলির এত ভয়।

শিবু দেখল, কয়েকজন বৃদ্ধ হাঁটু ভাঁজ করে পাশাপাশি বসে নদীর দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে আছে। ওদের মধ্যে একজন হাঁপাতে হাঁপাতে আর একজনকে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে। শিবু ওদের কথায় কান পাতল। লোকগুলির পাশে অপরাধীর মতো বসে পড়ল শিবু। হলদি নদী নিয়ে কি যেন কথা বলছে ওরা। কি বলছে! হলদি নদীর কথায় ওর আরো আগ্রহ বাড়ল। অনেকবার হলদি দিয়ে শিবুকে যাতায়াত করতে হয়েছে। এই গাইগাছি আসতেও ওকে হলদি পেরুতে হয়েছে। কি হয়েছে সেখানে? কান পেতে থাকে শিবু।

কে একজন বলল, হলদির দিকে যদি বান শুরু হয়ে থাকে, তাহলে বুয়েচ, আমরা বেঁচে গেলাম। হলদিতে বান মানেই মেদিনীপুর ভাসবে, আর চব্বিশ পরগণা রেহাই পাবে।

—তোমায় বলেছে। গলা সাফ করতে করতে প্রতিবাদ করল আরেকজন। নদীটা এই যে শুকিয়ে গেল, এর মানেই তো বান এদিকে আসবে। চেতাবনীর কথা কখনো মিথ্যে হয়।

—নাও আসতে পারে। হে ভগবান, মেদিনীপুরটা যেন ভাসে গো। আমাদের আর কষ্ট দিও না ভগবান। জোড় হাত করে দু-বার কপালে ঠুকে নিল বুড়োটা।

শিবুর ইচ্ছে হল, লোকটার মুখে একটা ঘুষি চালিয়ে দেয়। মেদিনীপুরের দিকে বান হবে কেন? ওদিকে কি মানুষ থাকে না নাকি! ভীষণ স্বার্থপর মনে হল ওর লোকগুলিকে। কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রাখল শিবু। মানুষমাত্রেই এরকম স্বার্থপর হয়। তাছাড়া লোকগুলো এখন প্রচণ্ড উত্তেজনায় ভুগছে। শিবু হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

—মেদিনীপুরের দিকে যদি বান হয়ও, আমার তো মনে হয়

আমরাও রেহাই পাব না। আমাদের সর্বনাশ আমি দেখতে পাচ্ছি।

—কেন ?

—নদীর এই শুকিয়ে যাওয়াটা একদম ভাল লক্ষণ নয়। আমার ঠাকুরদার মুখে শুনেছি, এই খালের মতো নদীর সঙ্গে পাতালের যোগ আছে। পাতালে যদি কোনদিন জলের অভাব ঘটে, তাহলে এই নদীর সমস্ত জল সেখানে চলে যাবে। আর তা যদি হয় তাহলে শুরু হবে মহামারী, বন্যা, দুর্ভিক্ষ। ভগবানের মার থেকে কে আমাদের বাঁচাবে বল।

—তোমার ঠাকুরদা গাঁজা খেত। হেঁ হেঁ হেঁ...

বুড়ো এই মারে তো সেই মারে। এত বিপদেও ওদের ভঙ্গি দেখে হাসি পেল শিবুর। কিন্তু হাসল না। নদীর সঙ্গে পাতালের যোগ থাক আর নাই থাক, নদীর পুরো জলই যে নিমেষে উবে যেতে পারে এটা ভাবতেই কেমন অদ্ভুত লাগে শিবুর। কিন্তু চোখের সামনে এই দৃশ্যই ও দেখতে পাচ্ছে এখন।

বুড়োদের আলোচনাটা এবার অন্যদিকে মোড় নিতে থাকে। শিবু আবার কান পাতল। কে একজন বলতে শুরু করেছে, নদীর আর দোষ কি বল, নদীর প্রয়োজন মানুষের জন্যে, কিন্তু মানুষ যদি মানুষ না থাকে নদী তো প্রতিশোধ নেবেই।

—কি বলতে চাও, ভনিতা না করে ভেঙে বল বাপু, আমি তোমাদের হেঁয়ালি বুঝি না।

—ভেঙে বলবার আর কি আছে, চারপাশে চোখ যায় না, দেখতে পাও না, পৃথিবীতে কত অনাচার ঢুকেছে। পৃথিবীরও সইবার একটা ক্ষমতা আছে।

বুড়োটা হাঁ করে শুনল। কথাটা মিথ্যে নয়, আজকাল আর কারোরই দেবদ্বিজে ভক্তি নেই। গ্রামের আচারনিষ্ঠা বলে যেটুকু আমাদের বাপঠাকুরদা রক্ষা করে এসেছিলেন, সেটুকু এখন সব গেছে। এত পাপের শাস্তি একটা হবেই।

শিবু এবারও প্রতিবাদ করতে পারত, করল না। মানুষের আচারনিষ্ঠা কিছুটা বদলেছে ঠিকই, কিন্তু কুসংস্কার আগলে থাকাও কোন কথা নয়। এখন এসব নিয়ে আলোচনার কোন মানেই হয় না। উঠে দাঁড়াল শিবু। বাউণ্ডারির ওপর লোকের ভিড় যেন আরো বেড়েছে। মাঠঘাট ভেঙ্গে আরো লোক আসছে এদিকে, উত্তেজনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ফুল্লরা আর মধুবাবু এখনো কী দরজা বন্ধ করে ঘুমুচ্ছে! ওরা কী এখনো টের পায় নি ঘরের বাইরে পৃথিবী এখন টলমল!

ঝিরঝিরে বৃষ্টিটা ততক্ষণে প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য অল্প অল্প বাতাসের টান বোঝা যাচ্ছিল। বাতাসটা পশ্চিমা। আকাশের মেঘ কী কিছুটা পাতলা হয়েছে, অন্ধকারে তা ঠিক ধরবার উপায় নেই। শিবুর মনে হল, ভোর হতেও খুব বেশি আর দেরি নেই। ভোর হলে চারপাশের পরিস্থিতি বুঝে ও চন্দনতলার দিকে রওনা হবে। পুষ্পরা যেন নিরাপদে থাকে ভগবান।

নদীর ঢালে কুকুরগুলি আবার চেঁচাতে শুরু করল। অন্ধকারের মধ্যেই ওরা নদীর দক্ষিণ দিকে ছুটে ছুটে যাচ্ছে, আবার হাঁ হাঁ করে ফিরে আসছে।

বাউণ্ডারির উপর দিয়ে শিবু দক্ষিণ দিকে খানিকটা এগোল। পশ্চিমা বাতাসটা ওর ভালো লাগল না। বাতাস সম্পর্কে যেটুকু ও বোঝে, তাতে পশ্চিমা বাতাস থেকেই ঝড় ওঠে। আবার হয়তো উঠবে।

হঠাৎ চমকে ওঠে শিবু। নদীর দক্ষিণ দিক থেকে প্রকাণ্ড একটা ফেনার পাহাড় যেন এগিয়ে আসছে। অদ্ভুত একটা গর্জন শুনতে পেল ও। বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল, কী ওটা! সমস্ত নদী ভরাট হয়ে এগিয়ে আসছে কী ও-গুলো! কিন্তু এত অন্ধকারেও ঐ সফেন জলরাশিকে চিনতে অসুবিধা হল না ওর।

শিবু চিৎকার করে উঠল, ও দাদা, ওদিকে দেখুন। ঐ যে।

বেশ কয়েকজন হুমড়ি খেয়ে এগিয়ে এল। আর সঙ্গে সঙ্গে চার-পাশে চিৎকার শুরু হয়ে গেল, আসছে, আসছে। বান আসছে।

শিবু বুঝতে পারল, নদীর শুষে যাওয়া জল আবার ফিরে আসছে। কিন্তু কী অদ্ভুত চেহারা সেই জলের! বিরাট একটা পাহাড়ের মতো সফেন জলরাশি গর্জন করতে করতে ধেয়ে আসছে। কুকুরগুলি চিৎকার করতে করতে উঠে এল বাউণ্ডারির ওপর। এ অবস্থায় কি যে করা উচিত ভেবে পেল না শিবু। মধুবাবুর বাড়ি গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার কথাও মাথায় এল না। বাউণ্ডারি থেকে নামলেই বিপদ ঘটতে পারে। রক্ষে, চার পাঁচ হাত উঁচু বাউণ্ডারি। জল যদি বাউণ্ডারি ভাসিয়ে মাঠের সঙ্গে এক হয়ে যায়, তাহলে এতগুলি লোকের সঙ্গে ওর ভাগ্য মিশে যাবে। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে শিবু। হাত পা কেমন শিথিল হয়ে আসে ওর।

চারপাশে ততক্ষণে কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেল। আর বিদঘুটে সব চিৎকার। মনে হল, কেউ যেন কারো কথা শুনছে না, কেবল চিৎকার। কেবল ভগবানের নাম। কেবল আপনজনকে খোঁজাখুঁজি করে সঙ্গে সঙ্গে থাকা।

ফেনার পাহাড় হু হু করে এগিয়ে আসছে। এসে গেছে, এসে গেছে! শিবু দেখল, বহুদূরে বাউণ্ডারি উপচিয়ে জল ঢুকে যাচ্ছে মাঠের দিকে। গর্জন কী জলের! এই তোড়ের মুখে পড়লে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না কাউকে। আশেপাশে বড় একটা গাছও দেখা যাচ্ছে না যে উঠে পড়বে শিবু। মাঠের দিকে কিছু কিছু ঝোপঝাড়, ভয়ে বাউণ্ডারি ছেড়ে কেউ কেউ তারই মধ্যে নেমে পড়ছে, নেমে গ্রামের দিকে ছুটতে শুরু করেছে কেউ কেউ। কিন্তু ভাল করছে না লোকগুলি। ওভাবে বাঁচা যাবে না। এই বানের মুখে এই বাউণ্ডারিটাই নিরাপদ মনে হল শিবুর।

শেষ পর্যন্ত এসেই পড়ল। ঘোলা জলের ঢেউ নিমেষের মধ্যে নদীটাকে ভরাট করে ফেলল। দেখতে দেখতে বেশ খানিকটা নদীর

জল ছলকে লাফিয়ে এল বাউণ্ডারির উপর। মাটি খামচে বসে পড়ল শিবু। জলের ধাক্কায় আর একটু হলে আছড়ে পড়ত নিচে। বড় জোর চোটটাকে সামলে নিয়ে আবার ও উঠে দাঁড়াল। কি যে ঘটছে বুঝবার জন্য চারপাশে একবার ভাল করে দেখে নিল শিবু।

এখন এপার-ওপার পুরোটাই ভরাট নদী। পাগলের মতো ঢেউ। বড় বড় ওপড়ান গাছ ভেসে যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে আরো কত কী। সব কিছু ঠাহর করা যায় না। শিবু জলের গতি-বিধি বুঝবার চেষ্টা করল। জলটা কী আরো ফুলবে, বুঝতে পারল না। কিন্তু ওদিকের সেই বাঁধভাঙা জল মাঠের দিকে গড়িয়ে আসছে। এইভাবে খানিকক্ষণ জল বাড়তে শুরু করলে পুরো মাঠটাই ডুবে যাবে। মাঠটা ডুবে যাওয়া মানে গ্রামটাও ডুববে। হয়তো গাইগাছি, গোশিঙাকে আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না। খুঁজে পাওয়া যাবে না মধুবাবুকে, ফুল্লরাকে।

কিন্তু শিবু এদের জন্য আর বিন্দুমাত্র ভাবে না, চুলোয় যাক। কিন্তু চন্দনতলায় পুষ্পরা কেমন আছে! বান কি চন্দনতলাটাকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেল! চন্দনতলার জন্যই বুকের ভিতর গুমড়ে ওঠে ওর। কী কুক্ষণেই যে বেরিয়েছিল শিবু!

জলটা বাঁধের ওপর থেকে খানিকটা নেমে গেল। প্রায় আট দশ হাত নিচে নেমে গেল। কিন্তু ঐ আসছে, আবার একটা আসছে। শিবু বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। সমুদ্রের ঢেউও বুঝি এত বড় হয় না। গর্জন করতে করতে ঢেউটা এগোচ্ছে। ভেড়িটাকে ভেঙে ফেলবে নাকি! মানুষের হাতে গড়া এই ভেড়ির কতটুকু মূল্য আছে ঢেউয়ের কাছে। এক ধাক্কাতেই বাউণ্ডারির এই অস্তিত্ব মুছে ফেলতে পারে নদী। কোন কিছুই যেন এখন আর নদীর অসাধ্য নয়।

যা হয়, তবু এই ভেড়ির ওপরই অপেক্ষা করে রইল শিবু। হ্যাঁ, দেখতে দেখতে ঢেউটা পাগলা ঘোড়ার মতো এগিয়ে এসে একটা ধাক্কা মারল বাউণ্ডারির ওপর। জল ছলকে ভেড়ির ওপর

দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোকে আবার তছনছ করে দিল। ছিটকে এদিক-ওদিক হয়ে গেল সবাই।

শিবুও জলের আঘাত সইতে পারল না। আছড়ে পড়ল নিচে। ভাগ্যিস নদীর দিকে না পড়ে মাঠের দিকে পড়েছে। গড়াতে গড়াতে হাত পঁচিশেক দূরে এসে একটা ঝোপের পাশে আটকে গেল। নাকে-মুখে এক গাদা কাদা-জল ঢুকে গেল ওর।

প্রাথমিক চোটটা সামলে নিয়ে আবার ও উঠে দাঁড়াল। বাউণ্ডারিটা একদম ফাঁকা হয়ে গেছে, কেউ নেই। ওটা যে ভাঙেনি, এই ভাগ্য। শিবু দেখল, মাঠঘাট ভেঙে সবাই ছুটতে শুরু করেছে। ছত্রখান হয়ে গেছে সবাই।

কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে থাকল শিবু। তারপর গ্রামের দিকে ছুটতে শুরু করল। আপাতত যতক্ষণ না ভোর হচ্ছে মধুবাবুর কাছেই আশ্রয় নিতে হবে। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়বে শিবু। যেভাবেই হোক, আজই পালাতে হবে।

বাড়ির উঠোনে এসে শিবু দেখতে পেল, দাওয়ায় একটা টুলের ওপর মধুবাবু। জেগেছে তা হলে! শিবু হাঁপাতে হাঁপাতে দাওয়ার কাছে এসে আছড়ে পড়ল।

মধুবাবু যেন ভূত দেখছেন, কি হল? কোথায় গিয়েছিলি?

শিবুর সারা গায়ে কাদা, কিম্ভূত চেহারা হয়েছে ওর। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, নদীর দিকে।

—নদীর দিকে। কেন, ওদিকে কেন? কি ওদিকে? বাউণ্ডারিটা আছে, না গেছে?

শিবু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, যায়নি মেসোমশাই, তবে যাবে। নদীর অবস্থা খুব খারাপ। বাপরে কী জোরে আমাকে বাউণ্ডারি থেকে আছড়ে ফেলল।

—আছড়ে ফেলল? কেন?

কেন কি। শিবু বুড়োর দিকে তাকাল। বানের জল যদি এ গ্রামে এসে ঢোকে, লোকটা নির্ঘাৎ মরবে। বলল, লক্ষণটা আমার ভাল মনে হচ্ছে না মেসোমশাই, এখনি সাবধান হওয়া দরকার।

—সাবধান! কী সাবধান! ফুল্ল ও ফুল্ল। তুমি কোথায় গো? মধুবাবুর গলার আওয়াজ মড়া কান্নার মতো শোনাল।

শিবু এপাশ-ওপাশ তাকায়, কী আশ্চর্য, এই ফুল্লরার ওপর কত নির্ভর করেন মধুবাবু। রাতে ফুল্লরার যে চেহারা দেখেছে শিবু, তা যদি মধুবাবু জানতে পারতেন, তা হলে হয়তো অমন করে আর ওর ওপর নির্ভর করতেন না। বুড়োর ভাগ্যটা সত্যি সত্যি খারাপ।

ফুল্লরার কোন সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না। মধুবাবু আবার ডাকলেন, কই গো—ফুল্ল, ও ফুল্ল।

এমন সময় বাড়ির পেছন দিক থেকে বেরিয়ে এল ফুল্লরা। আ মরণ, গলায় যেন মাইক লাগিয়ে বসেছে।

—কি হল? চেঁচাচ্ছ কেন, অ্যাঁ?

—চেঁচাব না। শিবু কি বলছে শুনে যাও না!

শিবুর দিকে চোখ পড়তেই ফুল্লরা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠে, ওমা, এ কি চেহারা হয়েছে গো বাবুর? ঝড়ের মধ্যে বুঝি দেশ-সেবা করতে বেরিয়েছিলে? ইস্, ভিজে ঢোল হয়ে উঠেছে গো।

শিবু সঙ্কোচে আবার গুটিয়ে গেল। ঠাণ্ডায় এমনিতেই হাড়ের ভেতরটা কাঁপছে, এখন যেন আরো বেড়ে গেল। তাছাড়া ফুল্লরার দিকে কোন মুখ নিয়ে আবার তাকান যায়! কোন সাহসে আবার ফুল্লরার ঐ চোখের দিকে তাকাবে শিবু!

ফুল্লরা আরো এগিয়ে এল, ওঠ, ওঠ, দেখি। এই ভিজে কাপড়ে থাকলে আর দেখতে হবে না। কাপড় পালটে নেবে এস।

শিবু চোখ না তুলেই বলল, কিছু হবে না। আমার অভ্যেস আছে। তাছাড়া এখন আর কাপড় পালটিয়ে লাভ নেই। বান এল বলে।

মধুবাবুও নদীর কথায় ফিরে এলেন, বাঁধের অবস্থা নাকি ভাল নয়, যে-কোন মুহূর্তেই নাকি ওটা ভেঙে যেতে পারে। তাহলে আমাদের কি হবে গো! ও ফুল্ল, এই বুড়ো বয়সে কী জলে ডুবে মরব!

—তুমি বাউগুরির দিকে গিয়েছিলে? ফুল্লরা প্রশ্ন করে।

শিবু এবারও ফুল্লরার দিকে তাকাল না, বলল, এতক্ষণ তো ওখানেই ছিলাম। সব জল গ্রামের দিকেই ছুটে আসছে।

বাঁধের দিকে তাকাল ফুল্লরা। চারপাশ একটু একটু করে ফরসা হতে শুরু করেছে। আকাশে এখনো থিকথিক করছে মেঘ। মাঠে হাঁটু পরিমাণ জল। ওটা বৃষ্টির জল, না নদীর কে জানে!

শিবু বলল, আমি নিজের চক্ষে খানিকটা বাঁধ ভাঙতে দেখেছি। সেইখান দিয়ে হু হু করে জল ঢুকছে। মাঠময় এ সবই হচ্ছে নদীর জল।

—নদীর জল। ওমা গো! রাতে এত সব কাণ্ড কখন হল, টের পাই নি তো! কী হবে এখন! ফুল্লরার গলায়ও আর্তনাদ ভেসে উঠল, কি হবে তাহলে? গরুগুলোকে তো ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু আমরা কোথায় যাব?

উঠোনের ওপর কুকুরটা এখনো পড়ে আছে। টিনের চালে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে আছে। কিন্তু এসব এখন তুচ্ছ ঘটনা, বান যদি আসেই তাহলে হাজার হাজার মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ফুল্লরা কি মধুবাবু, কি শিবু, কেউ রেহাই পাবে না। কেউ না।

মধুবাবু বললেন, তুমি একটা কাজ কর নাগো, গোপেনকে একটু ডেকে পাঠাও। দেখি, কি করতে পারি!

ফুল্লরা অবাক হল, কি করবে গোপেন?

—বলো যা টাকা লাগে এখনই একটা নৌকা চাই।

বুদ্ধিটা মন্দ নয়। বানের মধ্যে একটা নৌকো পেয়ে গেলে সত্যি সত্যি রক্ষা। ফুল্লরা উৎসাহ পেয়ে বলল, এই বাবু, ওঠ দেখি, গোপেনকে ডেকে আনি, চলো।

সন্দেহ নেই, রাত্রিটা ফুরিয়ে এসেছিল। ভোর-ভোর চেহারা হয়েছে পৃথিবীর। শিবু শুধাল, কোথায় ?

—কোথায় আবার, এই অল্প পথ, শিব মন্দিরের পাশ দিয়ে গেলে দু-মিনিট। চল না বাপু। বাঁচার পথটা দেখে রাখা ভাল।

মধুবাবুও তাড়া লাগালেন, যাওনা শিবু, তুমি সঙ্গে থাকলে কাজ হবে। আমার হাঁটাচলার ক্ষমতা থাকলে আমিই যেতাম।

শিবু মধুবাবুর আকুতি অবহেলা করতে পারল না। উঠে দাঁড়াল, ঠিক আছে, চলুন। কিন্তু আমি মেসোমশাই ওদিক দিয়ে শিকড়দর বাস রাস্তায় চলে যাব। এরপর যেবার আসব, কয়েকদিন না হয় এখানে থেকে যাব।

—বাস রাস্তা! বিস্মিত চোখে তাকাল ফুল্লরা, সেই ধকধক করা চোখ, তোমায় এখন যেতে দিচ্ছে কে শুনি ?

—বারে, যাব না। এদিকে তো এখনো সবাই চলেফিরে বেড়াচ্ছি, কিন্তু আমাদের মেদিনীপুরের অবস্থা ভাবা যায় না।

মধুবাবু তাকালেন, কি হয়েছে মেদিনীপুরে ?

—ভীষণ খারাপ অবস্থা মেসোমশাই। পুরো মেদিনীপুর এখন জলের তলায়।

—কে বললে ?

—শুনেছি। গম্ভীরভাবে উত্তর করল শিবু।

—কোথায় শুনলি ?

শিবুই এবার ফুল্লরাকে তাড়া লাগাল, কই চলুন। আর দেরি করা উচিত হচ্ছে না। প্রথম বাসটাই আমাকে ধরতে হবে।

ফুল্লরা কোমরে কাপড় গুঁজল, ওদিকে যদি বানে ডুবে গিয়ে থাকে তা হলে যাবে কি করে ? মাঝখান থেকে একূল-ওকূল দুকূল যাবে। না বাবু, তোমাকে আমি একা ছাড়তে পারব না। তাছাড়া আমাদের বিপদের মধ্যে রেখে তুমি চলে যাবে ? কেমন লোক গো তুমি ?

শিবু বলল, বিপদে ফেলব কেন, চলুন না, গোপেন না কি নাম বললেন, ওর নৌকো যাতে পাওয়া যায় তার বন্দোবস্ত করে যাব। নৌকো পেলে আর কিছু না হোক আপনারা প্রাণে বাঁচবেন।

মধুবাবু আবার প্রশ্ন করলেন, ওদিকে যে বান হয়েছে কে বললে শুনি না?

শিবু বলল, শুনেছি মেসোমশাই। না শুনে বলি নি। বাউণ্ডারির উপর সবাই তখন বলাবলি করছিল। তা ছাড়া আমার মনও বলছে, ওরা ভাল নেই।

—দূর পাগল, লোকের কথায় অত কান দিতে নেই। কিছু লোকের কাজই হচ্ছে কেবল গুজব ছড়ান।

শিবুর মনে হল, মধুবাবু এখন নিজের প্রাণের তাগিদেই শিবুকে ছাড়তে চাইছেন না। ভীষণ স্বার্থপর মনে হল ওর মধুবাবুকে। শিবু তাকিয়ে থাকল।

মধুবাবু তাড়া লাগালেন, যা না বাবা, ঘুরে আয় লক্ষ্মীটি। আমি এদিকে অবস্থাটা খোঁজ নেবার চেষ্টা করছি। আর, আমার সঙ্গে দেখা না করে যাবি না কিন্তু। সেরকম মনে হলে আমিই তোকে ঠেলে পাঠিয়ে দেব।

ফুল্লরাও তাড়া লাগাল, এসো দেখি। কেবল যাওয়া যাওয়া মন। হাত ধরে টানল শিবুর।

শিবু আলতো করে হাতটা ছাড়িয়ে নিল, চলুন।

আকাশ থমথমে থাকলেও চারপাশ পুরোপুরি ফর্সা হয়ে উঠেছে। সারা গায়ে কাদা মাখা, কাপড়-চোপড় জবজবে ভেজা। ভোরের বাতাসে শিবুর আবার কাঁপুনি শুরু হল। কিন্তু ওসব নিয়ে এখন ভাবলে চলবে না। শিবু এগোতে শুরু করল ফুল্লরার পাশে পাশে।

চার

বাড়ির পেছন দিকে গোয়ালের পাশ দিয়ে রাস্তা। গোয়ালের কাছে বিরাট একটা তেঁতুল গাছের ডাল ভেঙে পথ আটকে রেখেছে। এই ডালটাই কাল রাতে ভেঙে পড়ার শব্দ পেয়েছিল ওরা। শিবু দেখল, গোয়াল ফাঁকা। গরুগুলোকে ছেড়ে দেওয়ায় ওরা বেরিয়ে পড়েছে।

ফুল্লরা ডাকল, এদিকে এসো। গোয়ালের ভেতর দিয়ে বেড়া ফাঁক করে ওপাশে বেরিয়ে এল ফুল্লরা। শিবু অনুসরণ করল। বেড়ার ওপাশে যেতেই শিবু দেখল, একটা পুকুর, অর্ধেক তার তামাটে পানায় ঠাসা। দেখল, ডোবার ওপারে কয়েকটা কুঁড়েঘর। একটা আবার হেলে কাত হয়ে আছে। ওপরে চাল নেই, ওখানকার চালটাই কী উড়ে এসে ওদের উঠোনে পড়েছে, কে জানে। ঘরটার সামনে ছেলেমেয়ে বুড়ো একগাদা লোক। কেমন যেন অসহায় ভাব সবার। বানের জল যদি গ্রামের মধ্যে ঢোকে, তাহলে কিভাবে বাঁচা যাবে তারই জল্পনা-কল্পনা চলছে বলে মনে হল শিবুর।

ফুল্লরা বলল, কাল রাতে যে এত বড় ঝড় হয়েছে বুঝতেই পারি নি। কেন যে ভগবান এভাবে মানুষকে শাস্তি দেন!

শিবুর দেহের ভেতরে কাঁপুনিটা থামবার নয়। এখান থেকে পালাতে না পারলে আর থামবে না। । এই রাক্ষুসী মেয়েটার জন্যই কী এরকম হচ্ছে! কে জানে।

পুকুরের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে এসে একটা উঠোনে পড়ল ওরা। আর ওদের দেখেই কালো রোগা একটা বউ এগিয়ে এল, বাঁধ নাকি ভেঙেছে দিদি? তোমরা তো ওদিক থেকেই এলে, কিছু দেখেছ?

ফুল্লরার এখন অন্য চিন্তা। বিরক্তিতে মুখঝামটা দিল, দু-পা এগিয়ে গিয়ে তো দেখেও আসতে পার।

—আমরা শুনলাম বাঁধ ভেঙে গ্রামের দিকে নাকি জল ছুটে আসছে। আমাদের কি হবে গো দিদি, সবে আমাদের নতুন গরুর একটা বাচ্চা হয়েছে।

মানুষের কপালে কি আছে তারই ঠিক নেই, বাছুর নিয়ে কান্না। মাথা ঠাণ্ডা রাখল ফুল্লরা। বলল, কী আবার হবে! সবার যা হবে, তোমাদেরও তাই হবে।

ওরা দাঁড়াল না। আবার হাঁটতে শুরু করে। আরো আট দশটা উঠোন পেরিয়ে এসে বুঝতে পারল, সব বাড়িতেই উত্তেজনা। উত্তেজনাই স্বাভাবিক। কেউ কেউ আবার মড়া-কান্নাও জুড়ে দিয়েছে।

কিন্তু কান্নাকাটি চেঁচামেচি, ঝগড়াঝাটি কোন কিছুই আমল দিল না ওরা। এখন কে কাকে আমল দেয়! এখন চাচা, আপনা প্রাণ বাঁচা। বাড়িগুলি পার হয়ে একটা অনাবাদী মাঠ চোখে পড়ল। মাঠ ভর্তি জঙ্গল। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে এসে পুরনো মান্ধাতার আমলের একটা শিব-মন্দির। মন্দিরের চাতালে বেশ কিছু লোক জড় হয়েছে। শিবু লক্ষ্য করল, মন্দিরের চারপাশে নামকীর্তন শুরু হয়ে গেছে। স্বয়ং ভগবানই এখন বুঝি রক্ষাকর্তা।

ফুল্লরা একটু থমকে দাঁড়ায়, দাঁড়াও দেখি, একটা প্রণাম সেরে আসি।

মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করার কথা মাথাতেই আসে না শিবুর। বাড়িতে পুজোআচ্চা হলে শিবু তা থেকে দশ হাত দূরে থাকে। ওসব ভণ্ডামি ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু আজ কেমন যেন ওকেও দুর্বলতা এসে আঁকড়ে ধরল। মনে মনে মন্দিরের উদ্দেশ্যে শিবুও একটা প্রণাম সারল, হে ভগবান, পুষ্পরা যেন ভাল থাকে। তোমার কাছে আর কিছু চাই না ভগবান, পুষ্পকে কেবল ভাল রেখ। প্রণাম করতে

ঘাড় নিচু করল না শিবু, হাত তুলল না, কেবল চোখ বুজল। তারপ র তাকাল।

ফুল্লরা এগিয়ে গিয়ে মন্দিরের সিঁড়ির কাছে প্রণাম ক রার জন্য ঝুঁকে পড়ল। এই মুহূর্তে ওকে আরো বিস্ময়কর লাগল শিবুর। হতে পারে ও মধুবাবুর রক্ষিতা, কি আসে যায় তাতে। বিপদের সময় সব মানুষই এক। হয়তো কপালগুণেই ওকে রক্ষিতা হয়ে থাকতে হচ্ছে, নইলে আর দশ জনের সঙ্গে ওর তফাৎই বা কী।

ফুল্লরা ফিরে এল। শিবু শুধাল, প্রণাম করার সময় শিব ঠাকুরকে কি বললেন ?

ফুল্লরা ধারালো চোখে তাকাল, তোমাকে বলব কেন? তুমি তো বাপু আমার সঙ্গে কথাই বলতে চাও না। আমাকে দেখার পর থেকেই মুখ ঘুরিয়ে আছ।

মেয়েদের এই অভিমানী ভঙ্গিটা পুরুষদের বড় বিপাকে ফেলে। শিবু বলল, মিছিমিছি কেবল রাগ করছেন আমার উপর।

হঠাৎ রুখে উঠল ফুল্লরা, তুমি বার বার আমাকে আপনি আপনি কর কেন বল দেখি? আপনি আপনি করা মানেই তো দূরে দূরে থাকার চেষ্টা।

—না না, তা না।

—তুমি কি আমার চেয়ে ছোট নাকি যে আপনি বলবে? এরপর কবে শুনব, তোমার মেসোমশাইও আমাকে আপনি বলে ডাকতে শুরু করেছে।

শিবু হাসল, সব সময় অবশ্য বয়স দিয়ে সব কিছুর বিচার হয় না, সম্পর্কই বড় কথা। আপনার সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক তাতে আপনাকে আমার আপনি বলাই উচিত।

হঠাৎ একটা নাটক রচনা করে বসল ফুল্লরা। ঢিপ করে শিবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বসল।

—এই এই, কি হচ্ছে! শিবু আতঙ্কে দু-পা পিছিয়ে এল, সবাই দেখছে যে!

—বয়ে গেছে দেখলে। আমি তো কিছু অন্যায় করি নি। যা আমার করা উচিত, তাই করেছি।

—অন্যায় নয়! আমি কোথাকার কে ঠিক নেই, আমাকে প্রণাম করবেন কেন?

ফুল্লরা যেন আকাশ থেকে পড়ে, কোথাকার কে মানে, ওসব কী কথা। আমি কিন্তু তোমাকে প্রথম থেকেই আপন ভেবে নিয়েছি গো বাবু। নইলে অত আবদার করি।

রাতের প্রসঙ্গটা আবার না উঠলেই ভাল। কে জানে, রাতের ঘটনার জন্যই এসব ফল ভোগ করতে হচ্ছে কি না। শিবু কথা বাড়াল না।

ফুল্লরা বলল, তা ছাড়া তুমি আমার বড়, আমি একশবার তোমাকে প্রণাম করব। দেখুক না, লোকে দেখুক—

আবার ঝুঁকে প্রণাম করতে আসছিল ফুল্লরা, শিবু এবাব ধমকে উঠল, এ-রকম করলে কিন্তু আর কোনদিন আমার এদিকে আসা হবে না। আমি কখনো কারো প্রণাম নেই না।

—বেশ বললে যা হোক, পুষ্প তোমায় প্রণাম করে না, তোমার এঁটো পাতে খায় না?

শিবু হাসল, এই অসময়েও ওর হাসি পেল, কোথায় পুষ্প আর কোথায় এই ফুল্লরা। পুষ্পর মতো মেয়ে হতে হলে কয়েক পুরুষ সাধনা করতে হয়। বলল, গোপেনের বাড়ি চলুন, মিছিমিছি সময় নষ্ট হচ্ছে।

দু-পাশে বনবিছুটির ঝোপ। মাঝখান দিয়ে কাদা সপসপে রাস্তা। ঝোপের ভিতর দিয়েই ওরা এগোতে শুরু করে। সামান্য একশ-দেড়শ হাত পরেই আবার একটা মাঠ চোখে পড়ল, সেখানে কোমর উঁচু ধানের চাষ। কিন্তু কালকের-ঝড়ে কেউ যেন ধানক্ষেতে মই

লাগিয়ে গেছে, দেখে কষ্ট হয়। শিবু লক্ষ্য করল, মাঠে বেশ এক হাঁটু করে জল। জলটা বানের না বৃষ্টির, বোঝা মুস্কিল।

আল ধরে হাঁটতে শুরু করে ওরা। এমন সময় শিবু ভিন্ন প্রসঙ্গ টানল, একটা কথা খুব জানতে ইচ্ছে করছে। শুধোব ?

—ওমা, শুধোবে না কেন ? কি কথা ?

—আপনার বাবা মা নেই ?

ফুল্লরা একটু গম্ভীর হল। পরে স্বাভাবিক হতে হতে বলল, থাকবে না কেন, আছে। তবে না থাকারই মতো।

শিবু আরো কিছু শুনবার জন্য অপেক্ষা করল।

ফুল্লরা বলল, বছরের বেশির ভাগ সময়ই বাবা জেলে থাকে, আর মা এ-বাড়ি সে-বাড়ি ঝি-গিরি করে খায়। আমি সেদিক থেকে ভাগ্যবান।

—জেলে থাকে মানে ? প্রশ্ন করল শিবু।

ফুল্লরা ম্লান একটু হাসল, বলল, সে অনেক কথা, সে-সব থাক। তোমাকে বরং অন্য সময় বলব।

শিবুর কৌতূহল বাড়ল, জেলে থাকার কারণ দু-রকম হতে পারে, হয় চোর বা ডাকাত, নয়তো মার-দাঙ্গার রাজনীতিতে জড়ান। কী হতে পারে তাহলে।

ফুল্লরা বলল, আমরা দু-বোন। আমার ছোট বোন আমাদের না জানিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। আমি তো তবু বাপ মায়ের খবর নেওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু ও অন্যরকম।

ওরা আলটুকু পেরিয়ে এল। দু-চারটে বাঁশ ঝাড় পেরিয়ে একটা বাড়ির মুখোমুখি হল। কাছাকাছি একটা বড় গাছ উপড়ে পড়ে আছে, টিনের একটা চালার ওপর পড়েছে গাছটা, পড়ে কেউ জখম হয়েছে কিনা বোঝার উপায় নেই। কিন্তু বাড়িটা যেন শ্মশান। কারো কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

ফুল্লরা বলল, এটাই গোপেনের বাড়ি। গোপেন এখানেই থাকে। কিন্তু গেল কোথায় সব।

হঠাৎ একটা কুকুর ছুটে এসে চেঁচাতে শুরু করল। শিবু কুকুরের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করার ভঙ্গি করল। আহ্ আহ্, চেঁচাস না। সর সর।

কুকুরটা থামবার নয় দেখে শিবু এবার ঢিল তুলে তেড়ে গেল।

ফুল্লরা বলল, দাঁড়াও, ঘরে কেউ আছে কিনা দেখে নিই।

ঘরের দাওয়ায় উঠে উঁকি দিল ফুল্লরা। গোপেন আছ গো? ও গোপেন, কেউ আছে ঘরে?

ঘরের দরজাটা হাট করে খোলা। ফুল্লরা দরজায় পা দিয়েই চমকে উঠল। ঘরের মধ্যে ছু-তিনটে বাচ্চা। ফুল্লরাকে দেখে হাউমাউ করে চিৎকার করে উঠেছে। হায় কপাল, এগুলিকে একা ফেলে গেছে!

—এই এই, কি হয়েছে রে? তোদের মা কোথায়? বাবা?

বাচ্চাদের চিৎকার আরো বেড়ে গেল, আ-মরণ। এগুলিকে ফেলে গেল কোথায়? ফুল্লরা অসহায়ভাবে আবার বেরিয়ে এল।

এমন সময় উঠোনের পাশ থেকে ছুটতে ছুটতে হাজির হল ওদের মা। কেমন পাগল-পাগল চেহারা।

—ও বউ, কোথায় গিয়েছিলে? বাচ্চাগুলি তখন থেকে চেঁচাচ্ছে। গোপেন কোথায় গো?

বউটি কান্নায় ভেঙে পড়ল। দেখ, দেখে যাও দিদি, আমাদের ঘরটা কেমন করে ভেঙেছে দেখে যাও।

কিন্তু ফুল্লরার সেদিকে তখন নজর দেবার অবসর নেই। শুধাল, গোপেন কোথায় গো? আমাদের বাড়িতে একবার যেতে হবে। কর্তা ডেকেছেন।

—ও মিনসের হদিশ জানলে আমি চেঁচাই। কাল রাতে আমাদের নৌকো কোথায় ভেসে গেছে, সে-সব খুঁজতে বেরিয়েছে। ওদিকে শুনতে পাচ্ছি বান তো প্রায় এসে গেল। এখন আমরা কি করব দিদি? আবার কাঁদতে শুরু করল গোপেনের বউ।

—ও শিবনাথবাবু শুনলে ? কি বলছে ?

—শিবু বলল, গোপেন এলে দেখা করতে বলে যান। এ ছাড়া আর কিইবা করা যাবে।

—আমাদের কি হবে গো দিদি ? বউটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে পা জড়িয়ে ধরল ফুল্লরার।

ফুল্লরা হা-হা করে দু-পা পিছিয়ে এল। সবার যা হবে, তোমাদেরও তাই হবে। গোপেন বাড়ি ফিরলেই যেন একবার আমাদের সঙ্গে দেখা করে। বুঝেছ, এলেই একবার পাঠিও কিন্তু।

বাচ্চাগুলি ঘরের ভেতর তখনো চেঁচাচ্ছিল। শিবু বলল, চলুন, গোপেন যখন নেই, তখন আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। মেসোমশাই একা আছেন।

আবার ওরা ফিরতে শুরু করে। আজ আর সূর্য উঠবে না। বাতাস এখনো দাঁত চেপে থমকে আছে। আকাশ দেখলে মনে হয়, আরো কত দুর্ভোগ যেন কপালে লেখা আছে ওদের।

ফেরার পথে শিব মন্দিরের কাছে আর দাঁড়াল না ওরা। ঝোপের ভিতর দিয়ে হন-হন করে ছুটে পার হয়ে এল। বান যদি সত্যি সত্যি শুরু হয়ে থাকে সবচেয়ে বিপদে পড়তে হবে মধুবাবুকে নিয়ে। লোকটার এমনিতেই শরীর দুর্বল। তার উপর জল বাড়তে শুরু করলে আশ্রয় নেবারও জায়গা নেই। সারা গ্রামে একটা পাকা-বাড়িও চোখে পড়ে নি শিবুর।

অথচ মনে পড়ল, চন্দনতলায় অনেকগুলি পাকাবাড়ি। যে কোন একটা বাড়ির ছাদে উঠে পড়লে বানের হাত থেকে খানিকটা রক্ষা কে আটকায়। আর এখানে গাছের ডাল ছাড়া বাঁচার আর পথ নেই।

শিবু এ প্রসঙ্গে আর কথা বাড়াল না।

অবশেষে বাড়ির পেছনের গোয়াল ডিঙিয়ে নিজেদের উঠোনে এসে আবার হাজির হল ওরা। এসে অবাক, মধুবাবু কোথায়! এখানেই তো ছিলেন! গেল কোথায় লোকটা।

শিবু দেখল, ভেড়ির ওপর আবার ভিড় বেড়েছে। মেলাই লোক। নদীর জলটা কি আবার পাতালে ঢুকে যাচ্ছে। কিন্তু সামনের মাঠে বেশ জল দাঁড়িয়ে গেছে চোখে পড়ল। রাতেও অতখানি জল ছিল না ওখানে।

ফুল্লরা বলল, আ-মরণ, গেল কোথায় বল দেখি? আর পারি না। বাড়ির ভিতরে ঢুকে খুঁজে দেখল। না, কোথাও নেই।

শিবু বলল, আমার মনে হয় ঐ বাউণ্ডারির দিকেই গেছেন হয়তো।

—বাউণ্ডারির দিকে। ফুল্লরা অবাক হয়ে বাউণ্ডারির দিকে তাকাল। আচ্ছা চল তো বাপু, দেখে আসি। ভাবলাম তোমাকে কিছু খেতে দেব। রাতেও তো খাওয়া হয় নি তোমার।

শিবু বলল, আমার খিদে নেই, আর এরকম অবস্থায় কিছু খাওয়াও যায় না, চলুন দেখে আসি।

গায়ের ভেজা জামা-কাপড়গুলি এতক্ষণে প্রায় শুকিয়ে এসেছিল। কিন্তু কনুইয়ের কাছে সেই ঘষা জায়গাটায় আবার কেমন চিন চিন করে উঠল ওর।

হাত বুলিয়ে নিল, একটু ফুলে উঠেছে। কিন্তু, এবারও ফুল্লরার কাছে গোপন করার চেষ্টা করল শিবু।

উঠোন থেকে খানিকটা এগোতেই হাঁটু জলে নেমে পড়তে হল। কোথাও বা গর্ত, কোথাও কাঁটা ঝাড়। সাবধানে পা মেপে মেপে এগিয়ে এল ওরা। বাউণ্ডারির ওপাশে নদীর দিকে কি যেন একটা ঘটেছে। বাউণ্ডারির ওপর থেকে সবাই ওদিকেই ঝুঁকে পড়েছে।

ওরা কাদায় পা সামলাতে সামলাতে উঠে এল বাউণ্ডারির ওপর।

নদীর জল এখন হাত দশেক নিচে। কিন্তু কী প্রচণ্ড তোড় জলের। তেমনি জলের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে গাছগাছালি, বাঁশ, বেত, খড় আরো কত কি।

ওরা কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে শেষপর্যন্ত মধুবাবুর হদিশ পেল।

কে বলে মধুবাবু অসুস্থ। টুকটুক করে এতখানি পথ হেঁটে ভেড়ির ওপর তো উঠে এসেছেন। বসে হাঁ করে জলের দিতে তাকিয়ে আছেন। মধুবাবুর পাশে আরো কয়েকজন লোক। অস্বাভাবিক উত্তেজনায় যেন ফুটছে সবাই।

শিবুরা এগিয়ে এল, ও মেসোমশাই, আপনি এখানে? আর আমরা আপনাকে খুঁজে-খুঁজে হয়রান।

মধুবাবু ঘুরে তাকালেন। চোখের মণিদুটো কেমন রক্তশূন্য, শাদা। সারা মুখে কালির ছোপ।

—তোরা এসেছিস? আয়, নদীর জলে মড়া ভাসছে দেখে যা।

—মড়া। কিসের মড়া? চমকে ওঠে শিবু।

—বোস এখানে, আবার দেখতে পাবি। আমিই তিনটে ভেসে যেতে দেখলাম।

শিবু ককিয়ে ওঠে, কি মড়া বলুন না?

পাশ থেকে একটা লোক শিবুর আপাদমস্তক দেখল, মানুষ হে মানুষ! কোথায় কোন গ্রামের সর্বনাশ করে নদী এখান দিয়ে সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।

শিবুর পেটের ভেতর গুড়-গুড় করে ওঠে। মুখের ভেতর এক ঝলক নোনা জল উথলে ওঠে। নাক চেপে বমি আটকায় শিবু। এই মড়াগুলি কি মেদিনীপুরের দিক থেকে আসছে। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না আর।

—গোপেনকে পাওয়া গেল? প্রশ্ন করলেন মধুবাবু।

ফুল্লরাও হাঁ করে নদী দেখছিল, বলল, না, বাড়ি নেই। কালকের ঝড়ে ওর নৌকো কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, তাই খুঁজতে বেরিয়েছে।

—পাওয়া গেল না! কেমন যেন হতাশ দেখাল বুড়োকে। তাহলে এখানেই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। আয় শিবু, বোস এখানে। এতগুলোর লোকের যা হবে, আমাদেরও তাই হবে।

শিবু এগোল না। আঁতিপাঁতি করে কিছু যেন খুঁজতে শুরু করে। ফুল্লরা এগিয়ে এল, কি চাইছ?

শিবু বলল, আপনি বসুন, আমি একবার গোশিঙা যাব।

—গোশিঙা! তোমার কি আক্কেল বাপু। দেখছ না নদীর চেহারা!

আমি যাব আর আসব। সমিতির ছেলেদের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

—চারপাশে এই অবস্থা। এর মধ্যেও সমিতি! ফুল্লরা আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এগিয়ে এল। বেশ চল, আমিও যাব। এ দুর্যোগে তোমাকে আমি একা ছাড়তে পারব না বাপু।

—মাথা খারাপ! আপনি কোথায় যাবেন? আপনি বসুন।

নদী অনর্গল উথলে উঠছে, হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, ঐ ঐ, ঐ আর একটা।

সবাই আবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে, কি? কোথায়?

মাঝনদী দিয়ে একটা গরু ভেসে যাচ্ছে। তবু ভাল গরু, মানুষ নয়।

কেমন সাঁ-সাঁ করে জলের টানে ছুটে চলেছে গরুটা। গরুই তো, না আর কিছু! বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে সবাই।

জন্তুটা দৃষ্টির বাইরে চলে যেতেই শিবু বলল, মেসোমশাইকে একা রেখে আপনার যাওয়া উচিত হবে না। আপনি বসুন। আমি কথা দিচ্ছি, আবার ঘুরে আসব। আপনাদের সঙ্গে দেখা না করে পালাব না।

ফুল্লরা কি একটা বলতে গিয়ে কথাটা গিলে নিল। চোখের দৃষ্টিটা কেমন অসহায়।

শিবু বলল, বিশ্বাস করুন, ঠিক ফিরে আসব। কথা দিচ্ছি, আবার আসব।

মুখে আঁচল চাপা দিল ফুল্লরা। কান্না, না অভিনয়!

শিবু কেমন অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেল। ফুল্লরার অসাধ্য কিছুই নেই। এখনি কান্নাকাটি শুরু করে দিলে একটা কেলেঙ্কারি হবে। ধরা পড়ে যাবে শিবু। কেউ কি ওদের দিকে তাকিয়ে আছে এখন! নাহ্, এভাবে আর কিছুক্ষণ কাটালে রাতের ঘটনাটা যেন ফাঁস হয়ে যাবে। তাই যা ভাবছে ভাবুক ফুল্লরা, শিবু আর দাঁড়াল না। সাঁ-সাঁ করে বাউণ্ডারির ওপর দিয়ে ছুটতে শুরু করে দিল।

কিন্তু ছুটবে কি! পেছল কাদায় পা রাখা দায়। একটা লাঠি নিতে পারলে ভাল হত। গোশিঙায় গিয়ে প্রথমেই একটা লাঠি জোগাড় কবে নিতে হবে। গোশিঙা থেকে শিকড়দ' ঘণ্টা খানেকের পথ। মাঠ ভেঙ্গে যাওয়াটা হয়তো উচিত হবে না। এই বাউণ্ডারি ধরে ঘুর-পথেই এগোবে ও। শিকড়দ' বাসস্ট্যাণ্ডে হোটেল আছে। হোটেলে পেটপুরে খেয়ে নিতে হবে প্রথমে। তারপর বাসে একবার উঠে পড়তে পারলেই বাঁচা যায়।

ছুটতে ছুটতে বেশ খানিকটা এগিয়ে এসে শিবু পেছন ফিরে তাকাল। দূরে বাউণ্ডারির ওপব গিস-গিস করছে মানুষ। না কাউকেই আর আলাদা করে চেনার উপায় নেই। বেশ নিশ্চিন্ত লাগে ওর এ সময়।

পাঁচ

হাঁটতে হাঁটতে একসময় শিবুর মনে হল, বাতাসের বেগ আবার বাড়তে শুরু করেছে। একটু দাঁড়ায় শিবু। হ্যাঁ, আবার পশ্চিমা বাতাস। জলভার আকাশের মেঘগুলিকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে আসছে এদিকেই। কত বেলা হয়েছে বোঝার উপায় নেই। একে রাত-জাগা, তায় উত্তেজনা, চোখদুটো জ্বালা-জ্বালা করছে এখন।

সত্যি সত্যি কি ফুল্লরা তখন কেঁদে উঠেছিল, না অভিনয় করল। সব পারে ও, ওর অসাধ্য কিছুই নেই। মধুবাবুর জন্যেই কষ্ট হয় শিবুর। কি ভেবে উনি এরকম একজনের ওপর নিজেকে সমর্পণ করলেন, কে জানে!

চুলোয় যাক, মন থেকে ফুল্লরাকে মুছে ফেলার চেষ্টা করে শিবু। কিন্তু বার-বার সেই ফুল্লরাই। ভোর হওয়ার আগেই ওর সরে আসা উচিত ছিল। তাহলে আর দশজনের সামনে ওরকম করে পালিয়ে আসতে হত না। পেছন দিকে আবার তাকাল শিবু। নাহ্, নিশ্চিন্ত এখন।

কাদায় পা পিছলে যাচ্ছিল। জোরে হাঁটার উপায় নেই। বাউণ্ডারির এক পারে নদীর গর্জন, অন্যপারে ধানী জমি জলের তলায় ক্রমশ তলিয়ে যেতে শুরু করেছে। বাউণ্ডারি ছেড়ে নিচে জলকাদা ভেঙ্গে এগোন যেত, কিন্তু লাঠি ছাড়া অসম্ভব। লাঠি থাকলে ঝুঁকি নিতে পারত শিবু।

প্রচণ্ড ক্ষিধেও পেয়েছিল। ক্ষিধের জন্যেই বোধহয় এখন এত দুর্বল লাগছে।

মনে পড়ল, রাতে মুড়ির ডালা এগিয়ে দিয়েছিল ফুল্লরা। কিন্তু তখন মনের যা অবস্থা, ক্ষিধে থাকলেও শিবু খেতে পারে নি। এখন

গোশিঙাতে গিয়েও যদি খাবার না জোটে। যদি শিকড়দ'র সমস্ত দোকানপাট বন্ধ থাকে। কে খেতে দেবে ওকে। যে যার নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, কে ওর জন্য মাথা ঘামাবে।

আচ্ছা, একটা লোক না-খেয়ে কতদিন বাঁচে। যারা আমৃত্যু অনশন করে, তারা কতদিন অবধি লড়তে পারে। এক মাস, দেড় মাস। অসম্ভব। একবেলা না-খেয়েই শিবুর সারা শরীর ঝিমঝিম করছে এখন।

তবে কী ফুল্লরাদের ছেড়ে এসে ভুল করলাম। তবে কী ওখানেই পেটপুরে কিছু খেয়ে নিয়ে বেরুন উচিত ছিল। তবে কী—না, গোশিঙায় অনেক পরিচিত লোক পাবে শিবু। একটা-না-একটা বন্দোবস্ত ওখানে হবেই।

আর একটু জোরে হাঁটার চেষ্টা করে শিবু। এমন সময় দেখল, বেশ খানিকটা দূরে নদীর ঢালের দিকে একটা লোক। একা। কেমন সন্দেহজনক মনে হয় শিবুর। পরনে সামান্য একটা কানি, মাথায় পাগড়ির মতো গামছা বাঁধা।

কিন্তু ওখানে একা-একা কী করছে লোকটা।

শিবু আরো এগিয়ে এসে হাত নাড়ল, ও কর্তা, কি করছ ওখেনে? একা-একা?

লোকটার হাতে গুনসুতো। টুপ করে সুতোটা ও মাটিতে ফেলে দিল। শিবুর দিকে তাকাল, এমনি দাঁইড়ে আছি। হেঁ হেঁ করে হাসল লোকটা।

—দাঁড়িয়ে আছ! সন্দেহটা আরো জমাট বাঁধে শিবুর। বাড়ি কোথায়?

লোকটা বলল, গোশিঙা। নদীর চেহারা দেখতে এয়েচি।

—তবে গুনসুতো নিয়ে কি করছ?

—মাছ-ফাছ পেলে ধরব।

বাঙ্গালকে যেন হাইকোর্ট দেখাচ্ছে। শিবুর সন্দেহ যাবার নয়।

কিন্তু এখন আর এ নিয়ে মাথা ঘামাবারও সময় নেই। তবু জিজ্ঞেস করল, গোশিঙার অবস্থা কেমন ?

লোকটা পোকায়-খাওয়া দাঁত বার করে হাসল একটু। কেমন আবার, জল বাড়তে শুরু করেছে।

—জল বাড়ছে, আর তুমি ঘর-দোর ফেলে এখানে ?

—লোকটা নির্বিকার। বলল, জল আজ বাড়ছে কাল কমে যাবে।

—জল বাড়লে কি হতে পারে খেয়াল আছে ? নদী দিয়ে মড়া ভেসে যাচ্ছে দেখেছ ?

লোকটা অদ্ভুতভাবে হাসে, যার মরার সময় হবে, সে মরবেই। আমি মরব না। হাসল, হেঁ হেঁ···

—মরবে না, বলো কী হে! পৃথিবীতে এসেছ, মরবে না! তাও হয়।

হঠাৎ নজরে পড়ল শিবুর, মাটিতে খানিকটা গর্ত মতন, তাতে একটা ভেজা শাড়ি জড়ো করে রাখা।

—ওটা কি ?

লোকটা কেমন ঘাবড়ে গেল। তারপর ত্বরিতেই শাড়িটা কুড়িয়ে নিয়ে বাউণ্ডারি পেরিয়ে জলকাদা ভেঙে ছুটতে শুরু করল।

ঘটনাটা এমন আকস্মিক, শিবু পূর্বাপর বুঝতে পারল না। কাঁটা সমেত গুনসুতো ফেলে রেখেই পালিয়েছে লোকটা। তবে কী ঐ সুতো দিয়ে ও মড়া টেনে এনে গা থেকে কাপড় খোলার কাজ করছিল এতক্ষণ। শুধু কাপড়! গায়ে তো গয়নাও থাকতে পারে। কিন্তু লোকটা ততক্ষণে হাতের বাইরে বেশ খানিকটা দূরে চলে গেছে। শিবু থ হয়ে তাকিয়ে থাকল লোকটার দিকে। মানুষের অভাব বুঝি মৃত্যুকেও পরোয়া করে না।

আবার এগোতে শুরু করে শিবু। আর দু-একটা বাঁক পেরুলেই গোশিঙার হাটখোলা দেখা যাবে। হাটখোলা যাবার মুখেই সাধন জানার বাড়ি। সাধনবাবু জোতদার হয়েও পার্টির সমর্থক। সমর্থক

তো অনেক থাকে, কিন্তু সাধনবাবু আলাদা। ওঁর জন্যেই গোশিঙায় কৃষক সম্মেলন হতে চলেছে। জায়গা-জমি দিয়ে, অর্থ দিয়ে, এই সাধনবাবুই এত বড় ঝুঁকির সিংহভাগ মাথা পেতে নিয়েছেন।

শিবুর মনে পড়ল, সাধনবাবুর বাড়িটা দোতলা, পাকা। বন্যা যদি হয়ও ঐ বাড়ির ছাদে একবার উঠে পড়তে পারলে প্রাণে বাঁচা যাবে। এ সময় সাধনবাবুকে খুব নির্ভরযোগ্য মনে হল শিবুর। লজ্জা না করে সরাসরি ওঁর কাছেই কিছু খেতে চাইলে কেমন হয়! ক্ষিধের কাছে কখনো চালাকি চলে না। শিবু ঠিক করল, সাধনবাবুর কাছেই ও মুখ ফুটে খেতে চাইবে। এখন একটু জল খেয়ে গলা ভিজিয়ে নিতে পারলে ভাল হত। কিন্তু এত জল চারপাশে এ-জলে মুখ ছোঁয়ালে নির্ঘাৎ কলেরা।

দ্রুত হাঁটতে শুরু করে শিবু। মনে হল, নদীতে জলের মাত্রা যেন আরো বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে এক সময় আবার বাউণ্ডারি উপচাতে শুরু করবে কি না কে বলবে!

হঠাৎ একটা সাপ দেখে আঁতকে উঠে শিবু। না, ভয়ের কিছু নেই। সাপটা জলের তোড়ে ভাসতে ভাসতে আধ-মরা হয়ে পড়েছে। হঠাৎ ডাঙার স্পর্শ পেয়ে ওপরে উঠে আসছে। মেটে রং। হাতের কবজির মতো মোটা। শিবু গ্রাহ্য করল না। এসবে এখন ভয় পেলে চলবে না ওর।

বহু দূরে গ্রামের চিহ্ন চোখে পড়ল। গাছ-গাছালিতে-ঢাকা গোশিঙা গ্রাম। গ্রামের শেষ প্রান্তে সম্মেলনের প্যাণ্ডেল হওয়ার কথা, জায়গাটা এত দূর থেকে ঠাহর করতে পারল না শিবু। গতকালই ওখানে প্রচুর বাঁশ এনে জড়ো করা হয়েছিল। আজ প্যাণ্ডেল বাঁধবার জন্যে লোক লাগাবার কথা। কিন্তু এখন আর ওসব নিয়ে কে মাথা ঘামায়!

মাঠের ঢালের দিকে নেমে এল ও। মাঠের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে পারলে পথটা অনেক কমে যাবে। লাঠি ছাড়াই হাঁটু কাদায় পা

টেনে টেনে এগোতে থাকে শিবু। আবার ব্যাঙের ডাক কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশের দিকে তাকাল শিবু। আকাশটা মেঘের ভারে অনেক নিচে নেমে এসেছে। আবার নামবে, নির্ঘাৎ নামবে। পৃথিবীটাকে যেন সত্যি সত্যি না ভাসিয়ে ছাড়বে না।

কাদায় বারকয়েক হুমড়ি খেয়ে পড়তে-পড়তে নিজেকে সামলে নেয় শিবু। পথ তো নয় যেন কাদার নিচে ধারাল সব পাথরকুচি আর কাঁটা বিছিয়ে রাখা হয়েছে। পা-দুটো ছড়ে দফা-রফা হয়ে গেল। পায়ের ওপর দিয়ে লতার মতো কি সব গড়িয়ে যাচ্ছে, কে জানে সাপই কিনা!

শিবু সাবধানে এগোতে লাগল। অবশেষে এক সময় গোশিঙা গ্রামটাকে ছুঁয়ে ফেলল।

গ্রামের মুখে ঢুকতেই কয়েকজন এসে ছেঁকে ধরল শিবুকে, হ্যাঁ গো, কি দেখলে? গাইগাছির কি অবস্থা? ওদিকে নাকি বান শুরু হয়ে গেছে?

কাউকেই চেনা মনে হল না শিবুর। বলল, হয় নি ঠিক, তবে হয়ে যাবে। নদীর চেহারা একদম ভাল নয়। তাছাড়া নদীতে এখন নানারকম ডেডবডি ভেসে আসতে শুরু করেছে।

ডেডবডি বা মড়া ভেসে আসার কথাতে খুব একটা উত্তেজনা ছড়ালো বলে মনে হল না। ওটা যেন স্বাভাবিক ঘটনা। একজন এগিয়ে এসে শুধাল, নদীর জল নাকি বাউগুারি ছুঁয়েছে?

শিবু বলল, আমি অবশ্য বাউগুারি থেকে চার-পাঁচ হাত নিচে জল দেখেছি। তবে জলের তোড় ভাবা যায় না। তোড়ের মুখে পড়লে আর দেখতে হবে না।

আর একজন কথা কেড়ে নিল শিবুর, আমি তো দেখলাম জল এখন কানায় কানায়। বাঁধের মাটি হু-হু করে ক্ষয়ে যাচ্ছে। আর কয়েক ঘণ্টা ওরকম চললে বাঁধ-ফাঁদ কিছুই থাকবে না গো, সব উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

—ওদিকে চুনিয়া আর নবগ্রাম যা এখন পুরোপুরি জলের তলায়। আর একজন ঐসব গ্রামের অবস্থা বোঝাতে শুরু করল। ওখানে কত যে মরেছে তার শেষ নেই। গাছে চড়ে কিছু লোক বেঁচে থাকলেও জলের দিকে হা পিত্যেশ করে তাকিয়ে আছে। লোকগুলির না আছে খাওয়া, না আছে গলা ভেজাবার জল। কতক্ষণ যে ওরা ঐভাবে কাটাতে পারবে সেটাই এখন দেখার কথা।

এসব কথা শুনতে শুনতে শিবুর আরো দুর্বল মনে হয় নিজেকে। যাদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল তাদের কাউকেই ও চেনে না। শিবুও যে না-খেয়ে আছে একথা ওদের জানার কথা নয়। ফলে, এ অবস্থায় আর বকবক না করে সাধনবাবুর বাড়িতেই একবার যেতে পারলে হয়। কিংবা কালকের ছেলেগুলির সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়! চারপাশে আঁতিপাঁতি করে খুঁজল শিবু। না, কাউকেই ওর চেনা লাগছে না।

ওদিকে চুনিয়া আর নবগ্রাম যদি জলের তলায় ডুবে গিয়ে থাকে, তাহলে কি শিকড়দ'র বাস চালু আছে! কেমন সন্দেহ হয় ওর। শিবু শুধাল, আচ্ছা শিকডদ' দিয়ে এখনো কি বাস চালু আছে?

—বাস চলবে কি গো? এখন ও রাস্তায় মোটরলঞ্চ চলার মতো জল। সেদিক থেকে এই গোশিঙা গাইগাছিই এখনো ভালো আছে। আজকের রাতটা কোনরকমে কাটাতে পারলে মনে হয় এ-যাত্রা বেঁচে গেলাম।

—ওদিক দিয়ে যাওয়া যাবে না বলছেন?

লোকটা অদ্ভুত চোখে তাকাল, কোথায় যাবেন?

শিবু বলল, অনেক দূর। খেজুরি আর নন্দীগ্রাম থানা পার হয়ে চন্দনতলার দিকে।

—চন্দনতলা বোঝা গেল না। খেজুরি আর নন্দীগ্রাম থানা পার হয়ে, তার মানে মেদিনীপুরের দিকে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। জেলা মেদিনীপুর। যাওয়া যাবে না?

লোকটা জানতে চাইল, সম্মেলনের জন্য এসেছিলেন বুঝি? কিন্তু

মেদিনীপুরের যা খবর পাচ্ছি; সে তো আরো খারাপ। এই তো সকালবেলা মেদিনীপুরের দিক থেকে বিনোদ এল। এই বিনোদ! বিনোদ কোথায় গো? লোকটা জটলার দিকে তাকাল।

হিলহিলে পাতলা চেহারা বিনোদের। এগিয়ে এল, কি হল, কি হয়েছে?

শিবু শুধাল, আপনি মেদিনীপুরের দিক থেকে আসছেন?

—এসেছি মানে কি? নেহাৎ পরমায়ু ছিল, তাই কোনরকমে এসেছি আর কি!

শিবু বলল, আমার বাড়ি চন্দনতলা। যেতে পারব না?

চন্দনতলা বিনোদও চিনল না। বলল, আমি গিয়েছিলাম নন্দীগ্রাম থানায় আমাদের জমি দেখতে। বাউণ্ডারির বাইরের গ্রামগুলি একটাও নেই। ভেতরে যেগুলি, সেগুলির অবস্থাও ভাল নয়। জল অবশ্য ওদিকে এখন নামতে শুরু করেছে। কিন্তু সর্বনাশ যা করার করে দিয়ে গেছে। আপনি বাউণ্ডারি ধরে-ধরে এগোবার চেষ্টা করুন না, আর কে আছে আপনার সঙ্গে?

শিবু বলল, আমি একা।

—একা। তা একা ভাল। সঙ্গে এণ্ডি-গেণ্ডি থাকলে অসম্ভব ব্যাপার। এক কাজ করুন, আজকের দিনটা অপেক্ষা করে কাল ভোরে-ভোরে চিড়ে-মুড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন।

—এখানে কোথায় উঠেছেন? আর একজন জিজ্ঞেস করল।

শিবু বলল, সম্মেলন হবে শুনে এসেছিলাম। কাল রাতে গাইগাছি কাটিয়েছি।

—গাইগাছিতে কোথায়?

শিবু মধুবাবুর নাম বলতে কেমন সংকোচবোধ করল এবার, কিন্তু না বলে উপায় নেই। বলল, মধুসূদন গিরির বাড়িতে।

—গিরির বাড়িতে! অ! তা মধুবাবু কি বলছে? কেউ হয় বুঝি আপনার?

শিবু বলল, রাতে আর কোথাও থাকার জায়গা পাই নি, তাই ওখানেই উঠেছিলাম। তাছাড়া মধুবাবুর শরীরও ভাল নয়, শয্যাগত।

—আর মধুবাবুর নতুন বউটা? শুনেছি, ওই তো মধুবাবুকে রাখিতো রেখেছে।

লোকটার বাচনভঙ্গিতে হেঁয়ালি মেশান। শিবু বুঝল, ফুল্লরা কেবল গাইগাছিতেই নয়, গোশিঙাতেও আলোচিত। প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল শিবু। বলল, কিভাবে এগোই বলুন না, এখানে এসে যে এমন বিপদে পড়ব, কে জানত!

বিনোদ বলল, আমার মনে হয়, এখান থেকে সোজা কাকদ্বীপে যান। ওখানে নদী পারাপারের বোট পাবেন। বোটে পার হয়ে মন্দিরতলা, তারপর যা হয় অবস্থা বুঝে করবেন।

—তুমি যা বললে হে, এতে তো গোটা রাস্তাই ওকে হাঁটতে হবে।

বিনোদ বলল, হাঁটা ছাড়া আর কিভাবে যাবে শুনি?

—হাঁটা মানে দু-তিন দিন লেগে যাবে।

—লাগলে লাগবে। বিনোদ বলল, বাস কবে চালু হবে তার কি ঠিক আছে। আমার তো মনে হয়, একটু কষ্ট সহ্য করতে পারলে দিন দুয়েকের মধ্যেই তবু নিজের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছতে পারবে।

—বাড়ি কি বাউণ্ডারির কাছাকাছি?

শিবু বলল, না, মাইল ছ-সাত ভেতরে।

—তবে তো আর কথাই নেই। দুর্গা-দুর্গা বলে চলে যান। আর ভাই, কিছু চিড়ে-গুড় পুঁটলি বেঁধে নিয়ে যান। কোথায় কি পাবেন, তার ঠিক নেই। সম্বল কাছে রাখা ভাল।

চিড়ে-গুড় বেঁধে নিয়ে যাওয়ার যুক্তিটা শিবুর মনে ধরল। কিন্তু এখন এসব কোথায় জুটবে! ফুল্লরার কাছ থেকেই কিছু নিয়ে আসা উচিত ছিল ওর। এখানে হাটখোলায় যদি না পাওয়া যায়, ভিখিরির মতো ওকে চাইতে হবে লোকের কাছে। পকেটে এখনো

গোটা তিরিশেক টাকা থাকার কথা। একবার আলতো করে টাকাগুলি নেড়ে-চেড়ে দেখে নেয় শিবু। নাহ, ঠিকই আছে। হাটখোলায় পেলে ওখানেই ওসব কিনে নেবে শিবু।

বিনোদ বলল, চলে যান না। এ রাস্তা দিয়ে বরাবর গেলে হাটখোলা।

শিবু রাস্তার দিকে তাকাল। রাস্তাটা ওর চেনা। গতকাল এ রাস্তায় ও বার-কয়েক সাধনবাবুর সঙ্গে ছুটোছুটি করেছে। কোন কিছু করার আগে সাধনবাবুর সঙ্গেই প্রথমে ওর দেখা করা উচিত। একটা লাঠিও ওঁর কাছ থেকে চেয়ে নিতে হবে। তারপর অবস্থা বুঝে—

গ্রামের ভেতর ঢুকে পড়ল শিবু, দূর থেকে সাধনবাবুর পাকা বাড়িটাকে দেখতে পেয়ে হনহন করে এগিয়ে এল। কিন্তু বাড়ির সদরে এসে কেমন মিইয়ে পড়ল। বাড়ির সামনে বউ-ঝি আর বাচ্চা-কাচ্চার জটলা। কী হল রে বাবা! সাধনবাবু ছাড়া এ-বাড়ির কেউ শিবুকে চেনে না। ফলে, কেমন হতাশ হয়ে পড়ল শিবু। কত আশা করে ও এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু—

কথাবার্তায় বুঝল, সাধনবাবুর আট-দশটা ঘেরির মাছ সব নাকি ভেসে গেছে। বেশ কয়েক হাজার টাকার চোট। ভোর হতে না হতেই সাধনবাবু তাই ঘেরির অবস্থা দেখতে বেরিয়ে গেছেন। কখন ফিরবেন, কেউ তা বলতে পারে না।

একেই বলে কপালের ফের। একেই বলে অভাগা যেখানে যায়, সাগর শুকায়ে যায়। হতাশ হয়ে শিবু হাটখোলার দিকেই এগোল।

হাটখোলায় এসে দেখল, ইতস্তত কিছু লোক ঘোরাফেরা করছে। দোকানপাট দু-চারটি যা খোলা, তাতে কেনা-বেচায় কারো গরজ আছে বলে মনে হল না। অবশেষে ওখানেই কপাল-জোরে একটা চেনামুখ পেয়ে গেল শিবু।

—এই যে দুলুবাবু! শিবু যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছে। উত্তেজনায় হা-হা করে ছুটে গেল লোকটার কাছে।

ভুলু ওদের পার্টিরই লোক। ফিরে তাকাল, আরে আপনি! কখন এলেন? মাঠে একহাঁটু করে জল দাঁড়িয়ে গেছে। সম্মেলন-টম্মেলন সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জানেন তো?

শিবু স্বস্তি পেল, ভালই হয়েছে। এ অবস্থায় ওসব চলে না। কিন্তু দাদা আমি বড্ড বেকায়দায় পড়ে গেছি যে! আমাকে একটু সাহায্য না করলেই নয়।

ভুলু তাকাল, কি হয়েছে? আপনি তো কাল গাইগাছি চলে গিয়েছিলেন?

—গিয়েছিলাম। ওখানেই হয়তো থাকতাম, কিন্তু যা খবর পাচ্ছি, তাতে ভীষণ ভয় হচ্ছে। আমাদের বাড়িঘর সব নাকি ভেসে গেছে।

—ভেসে গেছে! ভুলু কেমন অবাক হল! আপনি মেদিনীপুর থেকে এসেছেন না? ও-সব খবর কে দিল আপনাকে?

শিবু বলল, মেদিনীপুরের দিক থেকে সর্বস্ব খুইয়ে যে-সব লোক আসছে তাদের মুখে শুনেছি। তাছাড়া ভুলুবাবু, কাল থেকে আমি না-খেয়ে আছি। এখন আর ক্ষিধের কথা না বলে পারলাম না। এখানে হোটেল নেই?

ভুলু এবার আপাদমস্তক দেখে নিল শিবুর। না-খেয়ে আছেন, আশ্চর্য। গাইগাছিতে কোথায় গিয়েছিলেন তাহলে?

শিবুর চোখ দুটো কেমন সজল হয়ে ওঠে, সে অনেক কথা, সে সব থাক। চলুন না, হোটেল যদি থাকে, আগে কিছু খেয়ে নিই।

ভুলু আবার ভাল করে শিবুকে দেখে নিল, ঠিক আছে, আপনি আসুন আমার সঙ্গে, দেখি কি করতে পারি।

খানিকটা আশার আলো দেখতে পেল শিবু। ভুলালই এখন ভরসা।

ছয়

দুলু বা দুলাল পার্টিরই লোক। পার্টির লোক বলেই হয়তো শিবু আশাতীত সাহায্য পেয়ে গেল ওর কাছে। পাত পেড়ে একপেট খেতে পেল শিবু। দুলালের ঘরে চিড়ে-মুড়ি কিছুই ছিল না, সের দুয়েক চিড়ে আর গুড় হাটখোলা থেকে কিনে এনে পুঁটুলি বেঁধে শিবুর হাতে ধরিয়ে দিল দুলাল। একটা বাঁশ কেটে চেঁছে শিবুকে একটা লাঠিও বানিয়ে দিল। একটা টর্চ সঙ্গে রাখতে পারলে সুবিধা হত। কোথায় কোন আদাড়ে-বাদাড়ে রাত কাটাতে হবে কে জানে! কিন্তু শিবু খেতে পেয়েছে এই যথেষ্ট। এরপর আর টর্চের কথা বলা যায় না। ঠিক করল, পথে কোথাও-না-কোথাও দোকান পাবেই, একটা দেশলাই কিনে নেবে। তারপর কপালে যা আছে। দুলালকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শিবু লাঠি আর চিড়ের পুঁটলি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

এখন অনিশ্চিত যাত্রা। পেছনে পড়ে রইল গাইগাছি, গোশিঙা। সামনে বিরাট জনমানবহীন মাঠ। ঐ মাঠের ভেতর দিয়ে ওকে এগোতে হবে। দুলুবাবুর কথা মতোই ও এগোবে। দুলাল ওকে আপনজনের মতো অনেক দূর এগিয়েও দিয়ে গেল। নানান রকম উপদেশ দিল। বার-বার করে বলল, কোনরকমে ঘুঘুরডাঙা চলে যান, সেখান থেকে হেঁটে আজই সোজা কাকদ্বীপ। কাকদ্বীপে রাতটা কাটিয়ে কাল ভোরে-ভোরে মন্দিরতলার দিকে এগোবেন। বেশি ঝুঁকিতে যাবেন না কিন্তু।

দুলাল বিদায় নেওয়ার পর শিবু আকাশের দিকে তাকাল। আকাশের মেঘ অনেক পাতলা হয়ে এসেছে। হয়তো ঝড়-বৃষ্টির হাত থেকে এবার রেহাই পাওয়া যাবে। বৃষ্টি যদি আর না হয়,

বানের জলও হয়তো নামতে শুরু করবে। তা হলেই বাঁচা যায়।

সাবধানে পা ফেলে-ফেলে হাঁটতে থাকে শিবু। তারপর হঠাৎ এক সময় মনে হল, চারপাশে মই লাগান ধানের ক্ষেত, হাঁটু অবধি কাদা জল, আর বহু দূরে-দূরে গ্রামের গাছ-গাছালির মধ্যে শিবু একদম একা। এখন ভরাট দুপুর। আকাশের পাতলা মেঘ ফাঁক হয়ে রোদের ঝলক না দেখা গেলেও কে বলবে সকাল অবধি কী ভয়াবহ চেহারা ছিল এই আকাশের।

সকাল বেলার বাতাসও এখন পুরোপুরি পাল্টে গেছে। অল্প-অল্প পুবালী বাতাস গায়ে লাগছিল ওর। ফাঁকা মাঠে বাতাসের একটা শব্দ থাকবেই, সেই শব্দটাই এ সময় ওকে ঘিরে ধরল।

দক্ষিণ কোণের ঐ গ্রামটাকে পেরুতে পারলেই ঘুঘুরডাঙা পৌঁছে যেতে পারে শিবু। অন্তত দুলাল ওকে যা বলেছিল, তাতে সে রকমই মনে হল ওর। তারপর এগোতে হবে কাকদ্বীপের দিকে। ঘুঘুরডাঙের ওপারেই আড়াক্ষিয়া। নদী আড়াক্ষিয়া এখন কী অবস্থায় আছে কে জানে! আড়াক্ষিয়ার ঘাটে নৌকো পেলে সেই নৌকোতেই এগোবার চেষ্টা করবে শিবু। আজই।

আলের ওপর দিয়ে বাঁশ ঠুকে-ঠুকে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল শিবু। আড়াক্ষিয়ার ঘাটে না পৌঁছন অবধি কিছুই বোঝা যাবে না। কাল রাতে নদীর যা চেহারা দেখেছে ও, তাতে নদী সম্পর্কে এত দিনকার সব ধারণাই ওর পাল্টে গেছে। নদীর কাছে মানুষ কত অসহায়!

শিবু হাঁটার গতিটা বাড়িয়ে দিতেই বুঝল, পিঠের ওপর রাখা চিড়ের পুঁটলিটা লাফাতে শুরু করেছে। লাফাক, পরোয়া করল না শিবু। গ্রামের যত কাছাকাছি এগোতে লাগল, ওর হাঁটার গতিও বাড়তে লাগল। অবশেষে একরকম প্রায় দৌড়তেই শুরু করে শিবু। শেষটায় হাঁপাতে-হাঁপাতে লোকালয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

গত রাতে এদিকেও যে প্রচণ্ড ঝড় গেছে, তা চোখে পড়ল।

বেশ কিছু গাছ উপড়ে পড়ে আছে। রাস্তায় হাঁটু কাদা। আর একটু এগোতেই দু-চারটে ভাঙ্গা মাটির বাড়ি দেখা গেল। ভাঙা বাড়িগুলোকে ঘিরে কিছু ব্যস্ত-সমস্ত লোক। কারোই যেন মাথার ঠিক নেই। শিবুকে দেখে অচেনা লোক বলে তাকায়। শিবুর যা চেহারা, কেউ হয়তো সন্দেহও করতে পারে ওকে, কিন্তু শিবু নিরুপায়।

হাঁটতে হাঁটতে হাটখোলা পেয়ে গেল শিবু। কিন্তু সব বন্ধ। একটা দোকানও খোলা নেই। সব যেন ঘর সামলাবার দায়ে দোকান-পাট বন্ধ করে বাড়ি গিয়ে বসে আছে। একপাশে দোকানের বেড়া বাঁধছিল দুজন লোক, শিবু এগিয়ে গেল, নদীর ঘাটটা কোন দিকে দাদা?

ওরা তাকাল। ভাল করে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল শিবুকে, কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

শিবু বলল, গাইগাছি থেকে। যাব মন্দিরতলা।

—মন্দিরতলা। লোকদুটো কেমন অবাক হল। মন্দিরতলা তো শুনছি বিশ হাত জলের নিচে।

শিবু বলল, মন্দিরতলায় আমার বাড়ি নয়, বাড়ি চন্দনতলা। ওদিক দিয়েই যাব ভেবেছিলাম।

—কি জানি কর্তা, কাকদ্বীপ গিয়ে ভাল করে খোঁজ-খবর করে নিও। ওদিকে সর্বনাশা বান হয়ে গেছে। যাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

শিবুর বুকের ভেতর আবার গুড় গুড় করে উঠল। কিন্তু এখন আর ফেরার উপায় নেই। যা থাকে কপালে, ওকে এগোতেই হবে।

আড়াক্ষিয়ার ঘাটের দিকে চলে এল শিবু। মেলাই লোক জমায়েত হয়ে আছে ওখানে। ওপারে নামখানা। নদীর দিকে হাঁ করে লোকগুলি তাকিয়ে আছে। নদীর জল যেন ঘোলা চন্দন। রাজ্যের আবর্জনা ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। এখানেও কী মড়া ভাসতে দেখা যাচ্ছে। মড়া দেখার লোভেই কী লোকগুলি তাকিয়ে আছে।

আশ্চর্য। পৃথিবীতে মানুষের কত কিছুই যে দেখার থাকে!

ঘাটে একটাও নৌকো দেখা গেল না। নামখানার সঙ্গে খেয়া চলাচলও নাকি বন্ধ হয়ে আছে কাল থেকে। ফলে, নামখানার অনেক লোক আটকা পড়ে আছে এপারে। সপসপে কাদায় আর জলে লোকগুলির দুর্গতির শেষ নেই।

শিবু আবার আকাশের দিকে তাকাল। অন্ধকার হয়ে আসছে। এখান থেকে কাকদ্বীপ বড় কম পথ নয়। যত তাড়াতাড়িই হাঁটা যাক, মাঝরাতের আগে পৌছন যাবে না। সন্ধ্যার পরে কি আর হাঁটা সম্ভব হবে! বুঝতে পারল না শিবু। কিন্তু এখানেই বা থাকবে কোথায়! এত লোকের ভিড় এখানে, এই ভিড়ের মধ্যে কোথায় মাথা গুঁজবে শিবু। বরং এগিয়ে যাওয়াই ভাল। যা থাকে কপালে, শিবু আবার এগোতে শুরু করল।

এদিকে তবু চলার মতো রাস্তা রয়েছে দেখতে পেল শিবু। রাস্তা তেমন নির্জনও নয়। লোক আসছে, লোক যাচ্ছে। লোক, না প্রেতাত্মা সব! বানে প্রাণ বিসর্জন দিয়েও যেন লোকগুলো পৃথিবীর মায়া কাটাতে পারছে না। এপাশে-ওপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক-একজনের চেহারা দেখলে গা ছমছম করে ওঠে, কথা বলতে সাহস হয় না। আবার না বললেও উপায় নেই।

—দাদা, কোথা থেকে আসছেন? একজনকে শুধাল শিবু।

—শ্মশান থেকে।

—আজ্ঞে! কি বললেন? শিবু ঠিক শুনল তো!

—শ্মশান ছাড়া কি আর! কচুবেড়ের দিকে কোনকালে যে মানুষের বসতি ছিল চিনতেই পারবেন না। মড়া ডিঙিয়ে-ডিঙিয়ে হাঁটতে হবে আপনাকে। একটু বেসামাল হয়েছেন কি মড়া তার হাত বাড়িয়ে আপনার পা জড়িয়ে ধরবে।

পাগল নাকি! অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকে শিবু।

লোকটা শুধাল, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

শিবু বলল, কাকদ্বীপ।

—কাকদ্বীপ! বলেন কী! খবরদার, আর এগোবেন না। আর এগোলে কেবল শ্মশান।

লোকটা ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্যেই যেন অমন করে বলল। বলেই আর দাঁড়াল না। আবার হাঁটা শুরু করে দিল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকটার চলার ভঙ্গি দেখল শিবু। আসল রহস্যটা কিছুই বুঝতে পারল না ও। কিন্তু যা থাকে কপালে, শিবু আবার এগোতে শুরু করল।

হাঁটায় এমনিতেই ওর অনভ্যাস নেই, কিন্তু সারাদিনের ধকলে পায়ে-পায়ে পা জড়িয়ে আসছে। লাঠিটাই এখন একটা বোঝা। কিন্তু কিছুতেই হাত-ছাড়া করা যায় না লাঠিটাকে। রাত্রিবেলা এটাই হবে ওর সম্বল।

বাতাস বেশ হালকা হয়ে উঠেছে। রাতের মধ্যেই হয়তো সমস্ত মেঘ কেটে যেতে পারে। শিবু হঠাৎ ভগবানকে ডাকল, হে ভগবান, আমি যেন বাড়ি ফিরে গিয়ে সবাইকে ভাল দেখতে পাই ভগবান। সবাই যেন ভাল থাকে। পরমুহূর্তেই মনে হল, ভাল থাকার হলে এমনিতেই থাকবে, ভগবানের কি করার আছে এতে! ভগবান যদি এতই মানুষের মঙ্গল দেখবে, তাহলে অমন ঝড় উঠল কেন। কেনই বা বন্যায় গ্রামের পর গ্রাম ধুয়ে-মুছে সর্বনাশ হল।

এমন সময় আবার একদল লোক আসছে দেখতে পেল শিবু। কারো বা মাথায় বাক্সপেটরা, কাঁধে ঝোলাঝুলি, কাঁখে বাচ্চাকাচ্চা। কেমন অবাক হল ও। ওরাও কি কচুবেড়ের দিক থেকে আসছে, ওরাও কি শিবুকে ভয়ের গল্প শোনাবে।

—কোথা থেকে আসছেন গো? প্রশ্ন করল শিবু।

একজন কে উত্তর দিল, ওপার থেকে।

—ওপার!

—হ্যাঁ গো, ওপার। ওপার চেন না? আমরা সেই যমরাজের

বাড়ি চলে গিয়েছিলাম, কিভাবে যে ফিরলাম তা ভগবানই জানেন।

আবার কেমন হেঁয়ালি লাগে শিবুর। তাকিয়ে থাকে।

মাঝবয়সী একজন মোটা মতো মহিলা বলল, ওদিকে যেও না বাবা, সন্ধ্যে হয়ে আসছে। ওদিকে গেলে আর ফিরতে পারবে না।

শিবুর সারা গা কাঁটা দিয়ে উঠল, কাকদ্বীপেও যেতে পারব না বলছেন?

—পারবে না কেন? তবে লাখো লাখো মানুষ সেখানে আটকে পড়েছে। শুয়োরের খোঁয়াড় জানো? কাকদ্বীপ এখন একটা শুয়োরের খোঁয়াড়। যে যেখান থেকে পারছে ঐ কাকদ্বীপে গিয়ে হামলে পড়ছে। কত লোক যে দাস্ত-বমি করতে করতে মরে গেল তার শেষ নেই। আমরা তাই পাইলে এলাম।

আর একজন বলল, চারপাশে কেবল দুর্গন্ধ। পেটের নাড়িভুড়ি উলটে আসে।

—কোথায় বাড়ি আপনাদের? প্রশ্ন করে শিবু।

—কচুবেড়ের কাছাকাছি, নদীর ওপারে। এখন আর নদীর এপার-ওপার অবশ্য কিছুই নেই, এখন সব একটাই নদী। আমরা কলার ভেলায় ভাসতে ভাসতে কাকদ্বীপে এসে পৌঁছেছিলাম বলে বেঁচে গেছি।

কলার ভেলায় এতগুলি লোক এতসব জিনিসপত্র নিয়ে নদী পার হয়ে আসা সহজ কথা নয়। কিন্তু লোকগুলি মিথ্যে কথা বলছে বলেও মনে হল না।

শিবু শুধাল, এখন কোথায় যাচ্ছেন?

—যাব নামখানার ওপার, কুটুমের বাড়ি গিয়ে আগে উঠি তো। পরে ভাবব কি করি।

লোকগুলো চলে গেল। শিবু আবার এগোতে থাকে।

দিনের উজ্জ্বল ফরসা ভাবটা কেমন ম্লান হয়ে আসছে। আকাশে বেশ কিছু কাক উড়ছে দেখতে পেল শিবু। কাক না অন্য পাখি কে

জানে। আকাশে উড়লে সব পাখিই কালো দেখায়। সব পাখিই একরকম দেখায়।

আর খানিক পরেই সমস্ত চরাচরে অন্ধকার নেমে আসবে। অন্ধকারে এই রাস্তায় কি হাঁটা যাবে তখন। কেমন সন্দেহ হয় শিবুর। অথচ হাঁটতে না পারলে রাত্রিটা কোথায় কাটাবে ও। বহু দূরে গ্রামের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। গ্রামে কারো কাছে সাহায্য চাইলে কি রাত্রিবাসের জায়গা দেবে না। কেন দেবে? কে কাকে বিশ্বাস করে? পরের জন্য চিন্তা করার সময় কোথায় এখন! যে যার নিজেকে নিয়েই যে ব্যস্ত।

শিবু আবার হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। লাঠিটাই এখন একমাত্র ভরসা। সামনের গ্রাম অবধি এগোতে পারলে, রাতে যেখানেই হোক ও কাটিয়ে দেবে। ভাগ্যিস দুলাল ওকে চিড়েটুকু জোগাড় করে দিয়েছিল। রাতে চিড়েগুড়ই খেয়ে নেবে শিবু। দুলালের ওপর কৃতজ্ঞতায় বুক ভরে ওঠে ওর।

আবার বেশ কয়েকজন এগিয়ে আসছে দেখতে পেল শিবু। এবার আর কথা বলতে ইচ্ছে হল না। লোকগুলির পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। তারপর সামনের গ্রামটাকে লক্ষ্য করে আবার দৌড়তে শুরু করল।

গ্রামে ঢুকবার মুখেই কিছু ঝোপঝাড়। ছমছমে অন্ধকার এসে ঝোপগুলোকে জড়িয়ে ধরেছে। শিবু দৌড়তে দৌড়তে হাঁপিয়ে পড়েছিল, আবার ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল। একটানা ঝিঁঝির ডাক শুরু হয়ে গেছে। হঠাৎ একসময় চমকে উঠল শিবু, ঝোপের ভেতর থেকে কঙ্কালসার এক বুড়ি বেরিয়ে এল। পরনে কানি, চোখদুটো খোঁদলে ঢোকান, যেন জ্বলছে। কে রে বাবা।

—এই বাবু, বুড়ি এগিয়ে এল, আমার টেপিকে দেখেছ?

—টেপি। শিবু যেন আকাশ থেকে পড়ল। টেপি কে?

—তিন সের করে দুধ দিত গো। হারামজাদি কোথায় যে গেল,

এই আঁধারে আমি কোথায় খুঁজি বল দেখি। আমার দেহে আর কত দেবে।

শিবু বুঝল, বুড়ির গরু হারিয়েছে। যেখানে মানুষকে মানুষই লোপাট হয়ে যাচ্ছে, সেখানে একটা গরুর জন্যে বুড়ি এখন অস্থির। শিবু বলল, যাবে আর কোথায়, আপনার টেপি আপনার কাছেই আবার ফিরে আসবে।

—তুমি তো বাপু বলে খালাস, কিন্তু সেই থেকে আমি খুঁজে-খুঁজে হয়রান। এই বয়সে আমার কত সয়। হারামজাদিকে একবার পেলে হয়—বুড়ি বিড়বিড় করে আবার এগোতে শুরু করে।

বুড়িটা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে শিবু আরো এগিয়ে এল, ডাকল, আচ্ছা বুড়িমা, রাতে এখানে কোথাও থাকা যাবে?

বুড়িটা তাকাল, থাকা যাবে মানে, কোথায় নিবাস তোমার?

শিবু নিজের অবস্থাটা বোঝাবার চেষ্টা করল। বলল, বাড়ি আমার মেদিনীপুর চন্দনতলা। এদিকে এসে বড্ড বিপদে পড়ে গেছি বুড়িমা। এখন কি যে করি!

—কি আর করবে। চলে যাও, ওদিকে গোহাটার খালি চালা আছে, ওখানে তোমার মতো ঘরদোর ছাড়া আরো অনেক এয়েছে। ওদের সঙ্গেই শুয়ে পড়গে যাও। বুড়ি যেন শিবুকে কাটাতে পারলে বাঁচে।

শিবু কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। রাত হওয়ার আগেই ওকে থাকার জায়গা খুঁজে নিতে হবে। ফলে, সেয়ানা বুড়িটাকে ছেড়ে গোহাটার দিকেই এগোতে শুরু করে শিবু।

কিন্তু বুড়ির কথাই ঠিক। গ্রামের শেষ প্রান্তে একটা খাল। খালের ধারে কয়েকটা একচালা। এদিক-ওদিক বেশ কিছু ঝাপড়ান বড় বড় গাছ। খালের ধারে, গাছের নিচে, এক-চালায় মানুষের জটলা। কোত্থেকে সব ছিন্নমূলেরা এসে আশ্রয় নিয়েছে। শিবু দেখল, কেউ কেউ ঐ স্যাঁতসেঁতে জল-কাদার ওপরই হাঁড়িতে ভাত

চড়িয়েছে। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে কেউ কেউ বেসামাল। এরই মধ্যে কেউ আবার গলাবাজি শুরু করে দিয়েছে। চারপাশে উত্তেজনা আর হৈ-চৈ।

খালের ধারে চলে এল শিবু। বাঁশের একটা হালকা সাঁকো ছিল বোধহয়, উড়িয়ে নিয়ে গেছে। এখন পারাপার করতে হলে নৌকো চাই। দু-একটা হালকা নৌকোও দেখা গেল, মাঝি হাঁকছে চার আনা, চার আনা।

নৌকোয় একটা খোঁচা মারলেই ওপারে যাওয়া যায়, এর জন্যে চার আনা! মাঝির সঙ্গে ভাড়া নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে লক্ষ্য করল শিবু।

একবার ওপারের দিকে তাকাল। ওপারে পরপর কয়েকটা বাড়ি। ঐ বাড়ির আশেপাশেও মেলাই লোকজন দেখা যাচ্ছে। খাল পার হয়ে ওপারেই চলে যাবে কি না ভাবল শিবু। এমন সময় বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে এক খেঁকুরে ভদ্রলোক শিবুকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নৌকোয় উঠবার জন্যে এগিয়ে গেল। শিবু আর একটু হলে কাদার মধ্যেই পড়ে যেত। অথচ ভদ্রলোকের ভ্রূক্ষেপই নেই।

শিবুর কি যে হল, শিবুও আর দাঁড়াল না। দলটার পেছন পেছন এগিয়ে গিয়ে নৌকোয় উঠে বসল।

—চার আনা, চার আনা, চার আনা।

—বুঝলেন দাদা, ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে। বানে আমাদের সর্বস্ব গেল, আর ওরা বড়লোক হতে চাইছে। পাশ থেকে কে একজন শিবুকেই লক্ষ্য করে বলল।

শিবু লোকটার দিকে তাকাল। মাঝারি বয়স। চোখে চশমা, এদিককার ডাঁট নেই, সুতো দিয়ে বাঁধা। লোকটার বয়স আর চেহারা দেখে শিবুর মনে হল, ভরসা করা চলে। শুধাল, ওপারে রাত কাটাবার জায়গা পাব তো?

লোকটা বলল, পাব শুনেই তো যাচ্ছি। এ পারের অবস্থা তো

দেখতেই পাচ্ছেন। লোকে এই খালপারে পায়খানার জন্যও আসে না, আর আমাদের এখন কী কপাল বলুন! মশাই কি একা?

শিবু করুণভাবে বলল, আজ্ঞে একা।

—আমিও একা। ভালই হল, আপনিও একা আমিও একা। দুজনে মিলে এখন আমরা দুজন হলাম। কোথায় যাওয়া হবে?

শিবু বলল, ভেবেছিলাম আজই কাকদ্বীপ পৌঁছে যাব।

—তারপর?

—তারপর কাল মেদিনীপুরের দিকে। আমার বাড়ি চন্দনতলা।

—তাই নাকি, তাহলে তো ভালই হল, আমাকেও কাকদ্বীপ হয়ে কচুবেড়ে ছাড়িয়ে সাগর দ্বীপের দিকে যেতে হবে। যেতে পারব কি না জানি না, কিন্তু মশাই বউ আমাকে ঝাঁটা-পেটা করে বার করে দিল, আমার শ্বশুর বাড়ি ওদিকেই।

কচুবেড়ের অবস্থা শিবু যা শুনেছে, তাতে সাগর দ্বীপের ভেতরে লোকটা কিছু খুঁজে পাবে কিনা কে জানে। লোকটার জন্যে শিবুর কেমন মায়া হল। ছিল ভাল, বিপদের মুখে এগোচ্ছে।

—কোত্থেকে আসছেন? শিবু শুধাল।

লোকটা বলল, সে মশাই অনেক দূর, নামখানা ছাড়িয়ে আরো পনের মাইল ভেতরে। আপনি?

শিবু বলল, আমি অবশ্য গাইগাছি গিয়েছিলাম একটা কাজে। গিয়ে কি বিপদেই যে পড়েছি, কি বলব! কাল সারাটা রাত ঘুমুতে পারি নি, আজ সারাটা দিনও বলবার নয়।

—চার আনা, চার আনা। চলে আসুন। মাঝির খদ্দের ডাকার ভঙ্গি শুনে মনে হল, যেন মচ্ছব শুরু হয়ে গেছে।

লোকটা এবার তাড়া লাগাল মাঝিকে, আর কোথায় তুলবে শুনি? এরপর কি এই খালের জলে ডুবিয়ে মারবে?

মাঝিরা নির্বিকার। গ্রাহ্যই করল না কথাগুলো।

শিবু শুধাল, খবর-টবর কিছু পেয়েছেন?

—কি খবর ? লোকটা একটা বিড়ি বার করল, চলে ?

শিবু বলল না, খাই না। শুনলাম কাকদ্বীপ নাকি লোকারণ্য হয়ে গেছে ?

—হবে না। কি ঝড়টা হল বলুন দেখি ? তবু ভগবানের কি দয়া, বন্যা আমাদের এদিকে না হয়ে মেদিনীপুরের দিকে হয়েছে।

শিবু থ হয়ে তাকিয়ে থাকল। পরে বলল, মেদিনীপুরের দিকেই বা হবে কেন, ওদিকে কি মানুষ থাকে না ? ওদিকের লোকের কথা একবার ভাবুন।

—তা তো বটেই। যে দিকেই হোক মানুষের দুর্গতির আর শেষ নেই।

—হাজার হাজার লোক নাকি মারা গেছে ?

লোকটা বলল, সে রকমই শুনেছি। মানুষ যে ঐ ঝড়ের পর এখনো বেঁচে আছে, এই তো যথেষ্ট।

শিবু বুঝল না লোকটা ওর মন-রক্ষা করার জন্যেই বলল কিনা।

মাঝিরা শেষবারের মতো হাঁকাহাঁকি করে নৌকো ছেড়ে দিল।

শিবু ওপারের দিকে তাকাল। বেশ অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে। বাতাসটা কেমন ঠাণ্ডা। দু-চারটে লণ্ঠনও এদিক-ওদিকে চলাফেরা করছে দেখতে পেল ও।

লোকটা বলল, তাহলে ভাই, রাতটা আমরা একসঙ্গেই থাকব। বলা তো যায় না, অচেনা জায়গা। সঙ্গে অবশ্য কিছুই নেই, তবু এই গামছাটাই যদি কেউ চুরি করে নিয়ে যায়, কি বলো। লোকটা তুমি সম্বোধন করল শিবুকে।

শিবু বলল, তা তো বটেই। একসঙ্গেই থাকব আমরা।

নৌকোটা টলতে টলতে এপারে এল। চার আনা করে পয়সা মাঝির হাতে তুলে দিয়ে ওরা নেমে এল।

—চলো এগিয়ে দেখি। শুনেছি এ গাঁয়ে একটা প্রাইমারি স্কুল আছে। ওখানেই গিয়ে উঠতে হবে।

ওরা খাল ছাড়িয়ে খানিকটা ভেতরে ঢুকে পড়ল। কয়েকটা

দোকানঘরের মতো মনে হল। কিন্তু সব বন্ধ। এই দুর্দিনে কে আর দোকান খোলে! দোকান যাদের তারাও হয়তো নিজেদের আত্মীয়-স্বজন দেখতে দূর দূর গাঁয়ে বেরিয়ে পড়েছে। দোকান খোলা না থাকলেও খুব একটা অসুবিধা হবে না শিবুর। সঙ্গে চিড়ে আছে। লোকটার কাঁধেও একটা ছোট্ট ব্যাগ ঝুলছে। ওরও সঙ্গে হয়ত কিছু খাবার আছে। না থাকে, এই চিড়েই জলে ভিজিয়ে দুজনে মিলে যা পারা যায় খেয়ে নেওয়া যাবে।

এদিক-ওদিক অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করল ওরা। অবশেষে স্কুল বাড়িটার সন্ধান পেয়ে গেল। গাদা-গাদা লোক ঢুকে আছে বাড়িতে। এ-পাশে ও-পাশে অনেকগুলি লণ্ঠন জ্বলছে। একটা টর্চ থাকলে এ সময় খুব কাজে লাগত।

—এর মধ্যে কোথায় জায়গা হবে! এ যে গিসগিস করছে মানুষ! শিবু কেমন হতাশ চোখে চেয়ে থাকে।

লোকটা কিন্তু হতাশ নয়। শিবুর হাত ধরে টানল, এসো, ঐ কোণের দিকে বারান্দাতেই বসা যাক। বারান্দা বলতে এবড়ো-খেবড়ো গরু রাখার জায়গা। কিন্তু এখন ও জায়গাটাই স্বর্গ। রাতে তো ঘুমোন যাবে না, বসে গল্প করেই কাটিয়ে দেব।

ওরা বারান্দায় একটা কোণের দিকে এগিয়ে এল। বারান্দাতেও কেউ কেউ খড় বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে। এত খড় পেল কোথায় এরা! খড় কি সবাই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে! না, গ্রামের বাড়ি থেকে চেয়ে এনেছে!

—আমাদেরও কিছু খড় দরকার। খড় পেলে বিছানার কাজ হয়ে যাবে। বলল শিবু।

লোকটা হাসল, দেশের বাড়িতে কত খড় এমনি এমনি নষ্ট হয়ে যায়, আর এখানে নাকি পয়সা দিয়ে কিনতে হচ্ছে। খড়ের জন্যে পয়সা খরচ কি ঠিক হবে! চলো তো গিয়ে বসি। পরে ভাবা যাবে সে-সব।

লোকটার একমাথা ঝাঁকড়া চুল। কেমন একটু পাগলা-পাগলা চেহারা। তা হোক, অসময়ে এই লোকটাকে পেয়ে শিবুর যেন সুবিধেই হয়েছে। বিপদে-আপদে পাশে লোক না থাকলে চলে না।

ওরা হাত পা ছড়িয়ে মাটির দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে বসল। সামনে এখনো কিছু কিছু লোক ঘোরাঘুরি করছে। ঘরের ভেতরে পোকার মতো কিলবিল করছে মানুষ। তাও যদি ঘরগুলোর ছিরিছাদ থাকত। কোথাও কোন দরজা নেই, জানলা নেই, ফলে ভেতরের চেঁচামেচি সবই এখন চোখের ওপর ঘটছে। বোঝা গেল, রাত্রি কাটাবার জায়গা নিয়েই খিটিমিটি চলছে এদিক-ওদিক। শিবু কান পেতে দুটো-একটা ঝগড়া বোঝবার চেষ্টা করল। এমন সময় লোকটা বলল, খাবার-দাবার যদি কিছু এনে থাক, এবার খেয়ে নাও। একেবারে সব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলাই ভালো।

শিবু শুধাল, আপনি ?

—আমি বাপু এক কোঁচড় মুড়কি এনেছিলাম। তা আসতে আসতে পথেই সব খেয়ে ফেলেছি, পেট আমার ভরা। কাল সকালে কাকদ্বীপ গিয়ে কিছু কিনে খাব।

—না না, সে কি হয়। আমার সঙ্গে চিড়ে আছে, দুজনে খাব। চিড়ের ঝুলিটা সামনে রাখল শিবু। লাঠিটা পিঠের দিকে ফেলে রেখেছিল। বলল, দাঁড়ান, একটু চোখে-মুখে জল দিয়ে আসি।

লোকটা বলল, ঐ আমগাছটার ওদিকে টিউব-কল আছে। যাও, চটপট ঘুরে এসো। এরপর আমিও হাত মুখ ধোব।

কোনটা আম গাছ। অন্ধকারে বুঝবার উপায় নেই। কিন্তু বেশ কিছু লোক ওদিকে জটলা করছে দেখে শিবু এগিয়ে গেল। হ্যাঁ, একটা টিউব-কলে হুড়োহুড়ি চলছে।

শিবু একটু দাঁড়াল। পা ভর্তি কাদা। হাত-পা ভাল করে ধোয়া দরকার। প্রাণ ভরে জলও খেতে হবে। জল খেয়ে চিড়ে খেয়ে ক্লান্তি কাটাতে হবে। একটুক্ষণ দাঁড়াতেই শিবু আবার ব্যাঙের ডাক

শুনতে পেল। বেশ জোরে করকর করে ব্যাঙ ডাকছে। আকাশটা আবার মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে। রাতেও আবার নামবে না কি রে বাবা! আবার যদি নামে, বারান্দায় জলের ঝাপটায় ভিজতে হবে। গায়ের এই জামা-কাপড় ছাড়া সঙ্গে আর কিছুই নেই। যেভাবেই হোক আর ভেজা উচিত হবে না ওর।

তাড়াতাড়ি হাত-পা ধুয়ে জল খেয়ে ফিরে এল শিবু। বারান্দায় উঠে এসে কোণের দিকে তাকাল, তাকিয়েই কেমন চমকে উঠল, লোকটা কোথায়। যাহ্ বাবা, কোথায় গেল। চারপাশে খুঁজল শিবু, তাইতো কোথায় গেল। লোকটাও কলের দিকে এগোল না তো! না, তাহলে চোখে পড়ত। শিবু হতাশভাবে দেখল, লাঠিটা কেবল একপাশে পড়ে আছে, চিড়ের পুঁটলিটা নেই।

চড়াৎ করে মাথায় রক্ত উঠে এল শিবুর। পালাল না তো! নাহ্, বিশ্বাস হয় না। পালাবে কেন! সামান্য দু-আড়াই কেজি চিড়ের জন্যে লোকটা অত নিচে নামবে! চুরি করবে! একটুক্ষণ থমকে রইল শিবু।

নাহ্, লোকটা যেন বাতাসের সঙ্গেই মিশে গেছে। রাগে ক্ষোভে শিবু থরথর করে কাঁপতে লাগল এবার।

আশেপাশে আরো লোক বসে আছে। শিবু একজনকে শুধোল, এখানে যে লোকটা বসেছিল, কোথায় গেল বলতে পারেন?

—কে? না মশাই, দেখি নি। ছোট্ট করে উত্তর দিল লোকটা।

—দেখেন নি, লাঠিটা আবার হাতে তুলে নিল শিবু, লোকটাকে যেভাবেই হোক খুঁজে বার করতে হবে। শ্-শালা। মুখে একটা গালাগালি এসে গিয়েছিল ওর। সামলে নিল। এমন তো হতে পারে, লোকটা পালায় নি, ধারে-কাছে হয়তো কোথাও গেছে। এখনি হয়তো আবার ফিরে আসবে। চট করে এখনি ওর জায়গাটা ছেড়ে যাওয়া উচিত হবে না।

শিবু হতাশভাবে বসে পড়ল। লোকটার সঙ্গে কেন যে ও অত আলাপ জমাতে গেল! কেন যে ঐ ডাকাতের মতো চেহারার লোকটাকে ও অত বিশ্বাস করতে গেল, এখন ফলভোগ ছাড়া উপায় কি। তবু ভাল, দুপুরে দুলাল ওকে পেট ভরে খাইয়ে দিয়েছে, নইলে, সারাটা দিনই আজ উপবাস যেত। আর তার ফল যে কি দাঁড়াত ভাবতেই কেমন গা শিরশির করে ওঠে ওর।

চারপাশে চোখ বুলিয়ে আবার তন্ন-তন্ন করে খুঁজল শিবু, না কোথাও নেই। রহস্যময়ভাবে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গেছে লোকটা। এখন রাতটা এভাবেই বসে-বসে একা কাটাতে হবে ওকে। মাটিব দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে হাঁ কবে তাকিয়ে থাকতে হবে। কী কুক্ষণেই যে চন্দনতলা থেকে বেরিয়েছিলাম!

শিবু ক্লান্তভাবে মাটির ওপর হাত-পা ছেড়ে দিল এবার। আরো কত চোব-চোট্টাব পাল্লায় পড়তে হবে কে জানে!

সাত

কতক্ষণ যে ঐভাবে বসেছিল মনে করতে পারে না, মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছে অবসাদ। সমস্ত শরীর কেমন শিথিল। কাল রাতে ফুল্লরাকে দেখার পর থেকেই যেন সব কিছু ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। ফুল্লরাই কি এ সবের জন্য দায়ী। হঠাৎই আবার ফুল্লরার কথা মনে পড়ে গেল ওর। কী অদ্ভুত যোগাযোগ! কী অদ্ভুত অভিজ্ঞতা! আচ্ছা, ফুল্লরা কি তখন বাউণ্ডারির ওপর মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সত্যি সত্যি কেঁদে উঠেছিল! না কি, অভিনয় করল! ফুল্লরার অসাধ্য কিছুই নেই। ফের যদি আবার কখনো দেখা হয়, ফুল্লরা কি আবার ওকে কাছে পাওয়ার জন্য ছেলেমানুষি করবে, নাকি চিনতেই পারবে না! চিনতে পারবে না হতে পারে না। তবে, না চিনতে পারার ভানও করতে পারে। সব করতে পারে ফুল্লরা। মধুবাবুকে শিখণ্ডী রেখে সব কিছু পারে ও।

গাইগাছির বাউণ্ডারির ওপারে নদীটা কি এখনো ফুঁসছে! এখনো কি নদী দিয়ে মড়া ভেসে যাচ্ছে! এখনো কি শ-য়ে শ-য়ে লোক ওখানে দাঁড়িয়ে মড়া-বয়ে-যাওয়ার দৃশ্য দেখছে।

অসম্ভব। হতেই পারে না! এখন মধুবাবুর বাড়ির দাওয়া থেকে সামনে মাঠটাকে নিশ্চয়ই নির্জন দেখাচ্ছে। কিন্তু গুনসুতো হাতে সেই লোকটা কি করছে এখন! একমাত্র সেই কি এখনো মড়ার গা থেকে গয়নাগাটি কাপড়-চোপড় নিয়ে নিজের অবস্থা ফেরাবার কসরত করে চলেছে! হয়ত ঐ গয়নার লোভেই বছর-বছর বন্যা হোক বলে লোকটা ভগবানের কাছে মানত করে, লোকটার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়েছিল, বন্যা হোক, ঝড় হোক, ভূমিকম্প হোক, ওর কি! যে মরে গেল তার জন্যে ওর দুঃখ-টুঃখ কিছুই নেই।

শিবুর অদ্ভুত লাগল, মানুষ কত বিচিত্র। মানুষ ধর্মেও থাকে অধর্মেও থাকে। মানুষ যে হাতে খুন করে সেই হাতেই আবার প্রাণ দেবার জন্য ছটফট করে। মানুষও কখনো কখনো সত্যি সত্যি গোলোকধাঁধা।

হঠাৎ কিছুটা গুঞ্জরণ উঠল চারপাশে। কেমন চমকে উঠেছিল শিবু। সামনের দিকে তাকাতেই বুঝতে পারল, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। হায় কপাল, আবার বৃষ্টি! তবু ভাল, বাতাসের ঝাপ্‌টা নেই, কেবল বৃষ্টি। বাতাসের ঝাপ্‌টা থাকলে এখন নির্ঘাত বসে বসে ভিজতে হত।

বৃষ্টিটা তেমন জোরে নয়, কিন্তু এ বৃষ্টিতে পথ-ঘাট আবার চলার অযোগ্য হয়ে উঠবে। ভাগ্যিস লাঠিটাও খোয়া যায় নি। লোকটা ইচ্ছে করলে লাঠিটাও তো তুলে নিয়ে যেতে পারত। মানুষকে বিশ্বাস করার খেসারত দিতে হচ্ছে এখন।

আবার বাড়ির কথা মনে পড়ল। বাড়ির কি অবস্থা এখন কে জানে! বড় ঘরের পেছন দিকে নতুন লাগান জামরুল গাছটাকে ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল কিনা কে বলবে। মনে পড়ল, রথের মেলা থেকে এত কিছু থাকতে পুষ্প ঐ গাছটাকেই কিনে এনেছিল। বেশ বাড়-বাড়ন্ত হয়ে উঠেছিল গাছটা। চারদিকের এত ঝড়ের পর গাছটার না জানি কি অবস্থা হয়েছে। সামান্য একটা গাছ বই তো নয়, কিন্তু তার জন্যেও মন খারাপ হয়ে গেল শিবুর।

বৃষ্টিটা এবার জোরেই নামল। চারপাশে খই-ফোটার শব্দ। যারা বাইরে ঘোরাঘুরি করছিল তারা আবার ছুটতে ছুটতে স্কুল বাড়িতে ঢুকে পড়ল।

কিন্তু সেই হারামজাদা লোকটা গেল কোথায়! লোকটা কি একা-একাই কাকদ্বীপের দিকে রওনা হল। এমনও তো হতে পারে, লোকটা পুরোটাই মিথ্যে বলেছে। শিবুকে ফাঁকি দিয়ে ওর চিড়ে-গুড় নিয়ে পালাবার কারসাজি ওটা। লোকটাকে অত সহজে

বিশ্বাস করা উচিত হয় নি ওর। পাশের লোকগুলির দিকে তাকাল, অন্ধকারে ভূতের মতো বসে আছে সবাই। যে-যার নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত যেন।

শিবু দেয়ালে পিঠ দিয়ে স্থির হয়ে থাকে। এ রকম তোড়ে ঘণ্টাখানেক বৃষ্টি হলে নদীর জল আবার বাড়তে শুরু করবে। আরো দুর্গতি বাড়বে মানুষের।

অথচ কিছুই করার নেই কারো।. হাতের বাইরে এই বৃষ্টি। হাতের বাইরেই সমস্ত পরিস্থিতি। শিবু চোখ বুজল। ভীষণ অবসন্ন লাগছে। পেট পুরে কিছু খেয়ে নিতে পারলে শরীরের ক্লান্তিটা বোধহয় কমত। কিন্তু এই দুর্যোগেও মানুষের কাছে মানুষ কত অভিশাপ।

গ্রামের লোকগুলিই বা কি রকম! এতগুলি ঘর-ছাড়া অসহায় লোক এখানে আশ্রয় নিয়েছে, এদের কিছু সেবার দায়িত্বও কি ওরা নিতে পারে না! নিদেনপক্ষে দোকানগুলি আজ খুলে রাখা উচিত ছিল ওদের। পকেটে পয়সা আছে অথচ কিছু যে কিনে খাবে শিবু তারও উপায় নেই। এ রকম ঘটনা যদি চন্দনতলায় ঘটত, শিবুরা ঝাঁপিয়ে পড়ত। বাড়ি-বাড়ি থেকে ভিক্ষে করে এনে হলেও শিবুরা ওদের সবাইকে খাওয়াবার চেষ্টা করত। মানুষের দুর্দিনে মানুষ পাশে দাঁড়াবে না, এ-কথা শিবু ভাবতেই পারে না।

—এই যে ছেলে, পা-টা একটু সরাও দেখি। কেমন করে বসেছে দেখ।

চমকে উঠেছিল শিবু। সঙ্গে সঙ্গে পা গুটিয়ে নিল। দেখল, বেশ লম্বা মতো একজন মহিলা। ওর পায়ের ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে যাবে না বলে মহিলাটি থমকে দাঁড়িয়েছে।

শিবু আমতা-আমতা করে জিজ্ঞেস করল, এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় যাবেন ?

মহিলাটির দোহারা চেহারা। পেছন থেকে দেখলে হয়ত ফুল্লরা

বলে ভুল করত শিবু। ভাগ্যিস ফুল্লরা নয়! এখানে এ অবস্থায় ফুল্লরাকে দেখলে হার্টফেল করত ও।

মাহিলাটির মুখের রেখা অন্ধকারে বোঝার উপায় নেই। কিন্তু তাকে ভীষণ বিচলিত বলে মনে হল শিবুর। তাকিয়ে রইল।

মহিলাটি বলল, আমাদের টুনি বোধহয় আর বাঁচবে না গো। শুনলাম গাঁয়ে একজন ডাক্তার আছে। একবার দেখি, যদি তাঁকে আনতে পারি।

—কি হয়েছে? প্রশ্ন করল শিবু।

—হয়েছে আমার কপাল। এমনিতেই তিন-চারদিন ধরে জ্বরে ভুগছিল, তার ওপর বাড়ি ঘর যখন ভেসে গেল কিভাবে যে ওকে বুকে করে জলের মধ্যে হ্যাঁচর-প্যাঁচর করে এখানে এসে পৌঁছলাম, তা ভগবানই জানেন। সকাল থেকে সেই যে মেয়েটা চোখ উলটে পড়ে আছে আর কথাই বলে না গো!

পাশের কে একজন বলল, ডাক্তার-ফাক্তার এ-গাঁয়ে থাকলে তো আসবে! দিনের বেলা এরা তিন-চারবার খুঁজে এসেছে।

শিবুর কেমন মায়া হল। শুধাল, কোথায় বাড়ি আপনাদের? কোথায় যাবেন?

মহিলাটি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল, কোন্ চুলোয় যে যাব কিছুই জানি না বাবা। আর কিছু আমি ভাবতেও পারছি না। আমার টুনির কি হবে গো! ওফ্-ও ও—

শিবু শুধাল, আপনার টুনিকে কোথায় রেখেছেন? চলুন তো একবার দেখে আসি।

—দেখবে? মহিলাটি হাত জড়িয়ে ধরল শিবুর। তোমার কাছে ওষুধ আছে? আমার মেয়েটাকে বাঁচিয়ে দাও না বাবা! কি বিপদেই যে পড়েছি বাবা গো—

—ওষুধ! শিবু ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাল। চলুন না, একবার দেখে নিই। দরকার হলে আমিও না'হয় ডাক্তারের খোঁজ করে দেখতে পারি।

প্রচণ্ড বৃষ্টি। এ বৃষ্টি হয়তো সারা রাতই হবে।

মহিলাটি শিবুকে নিয়ে একটু এগিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। গিসগিস করছে মানুষ। এক কোণে চলে এল ওরা। একপাশে একটা তেলের ডিবে জ্বলছে। সেই ফিকে আলোয় শিবু দেখল, বছর দশ-বারোর একটা মেয়ে মেঝেয় খড়ের ওপর শুয়ে আছে। কেমন যেন স্থির দৃষ্টি।

—টুনি, ও টুনি। ডাকল মহিলাটি।

শিবুও একটু ঝুঁকল, বেঁচে আছে তো! ওভাবে তাকিয়ে আছে কেন! জীবন্ত মানুষের দৃষ্টি কী অমন হয়! বুকের ভেতর কেমন যেন ধক করে উঠল ওর। ওপাশে তাকাল, কারা যেন নিঃশব্দে থালা গ্লাস নিয়ে রাতের খাওয়া সারতে বসেছে। বেঁচে থাকতে হলে না খেয়েই বা উপায় কি!

শিবু মহিলাটির দিকে তাকাল। স্নেহ মানুষকে অন্ধ করে রাখে, নইলে মহিলাটির বোঝা উচিত টুনি আর বেঁচে নেই। কোন জীবন্ত মানুষের দেহ কী অমন নিষ্পন্দ হয়!

—কতক্ষণ ধরে ওরকম তাকিয়ে আছে ও? প্রশ্ন করল শিবু।

মহিলাটি টুনির পাশে উবু হয়ে আবার বসে পড়ল, টুনি, ও টুনি। কথা বলছিস না কেন? আমার টুনি কি আর কথা বলবে না ছেলে? ও-ছেলে, বল না গো, আমার টুনি কি—

শিবু বলল, কাল সকাল অবধি অপেক্ষা করুন। এখন আর ওকে বিরক্ত করবেন না। যা করার কাল সকালেই করবেন।

ধীরে ধীরে সরে এল শিবু। এসব ক্ষেত্রে পালানো ছাড়া গতি নেই। ঘর থেকে বাইরে বারান্দায় এসে দম-ভরে আর একবার শ্বাস টানল শিবু। বাইরে তবু শ্বাস টানার প্রচুর বাতাস। কিন্তু ঘরের ভেতর মিনিট কয়েক থাকলেই যেন দম বন্ধ হয়ে মরে যেত ও! আকাশের দিকে তাকাল শিবু, কেবল বৃষ্টিই নয়, মেঘের গর্জনও শুরু হয়েছে। এলোপাতাড়ি বাতাসও।

বারান্দায় এখন জলের ঝাপটা বাঁচাতে ঠায় দাঁড়িয়ে কাটাতে হবে ওকে।

মানুষের মৃত্যু নিয়ে কোনদিনই ভাববার অবসর পায় নি শিবু। মৃত্যু নিয়ে ভাববার মতো সময়ও হয় নি ওর। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর বাবার মৃত্যুর কথা মনে পড়ল। এক মাস ধরে ভুগে ভুগে একদিন গভীর রাতে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করল ওর বাবা। সেদিন মৃত্যুশয্যায় দাঁড়িয়ে নিথর হয়ে শেষ পর্বটির জন্য অপেক্ষা করেছিল সবাই। আর কিছুই করার ছিল না কারো। ডাক্তার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন অনেক আগেই। ঘরের ভেতর ছমছমে লণ্ঠনের আলোয় কোন এক অশরীরী শক্তি যেন এগিয়ে এসে বাবার চোখ-দুটোকে আধ-বোজা করে দিয়ে চলে গেল।

বাবার জন্য হঠাৎ যেন নতুন করে বুকের মধ্যে একটা কষ্ট অনুভব করল শিবু। কিন্তু টুনিকে দেখে ওর বাবার কথা মনে পড়ল কেন! নদীর জলে কত তো মৃতদেহ ভেসে যাচ্ছে, কই সে সময় তো বাবার কথা মনে হয় নি ওর। তবে কি টুনির ঐ স্থির দৃষ্টিটাই অমন করে মনে করিয়ে দিল বাবাকে!

শিবুর হাত-পা কেমন অবশ হয়ে এল। পেটের ভেতর কেমন আবার বমির ভাব ঘুলিয়ে উঠল। নিজেকে আর স্থির রাখতে পারল না শিবু। দেয়ালে পিঠ রেখে ধীরে ধীরে বসে পড়ল বারান্দায়।

চোখে-মুখে পাতলা কিছুটা জলের ঝাপটা লাগতেই নিজেকে আবার ফিরে পেল শিবু। তখনো অঝোরে অফুরন্ত বৃষ্টি হচ্ছে। বিদ্যুৎ ঝলকে চারপাশ মাঝে মাঝে ঝলসে উঠছে। কেমন এক অলৌকিক জগতের বাসিন্দার মতো মনে হচ্ছে সবাইকে। তাকাতে ভয় হয়। হয়তো টুনির মতো সবার চোখেই এখন নিষ্প্রভ দৃষ্টি। মৃত্যু যেন বিশাল একটা পাখির মতো ডানা মেলে এই স্কুল বাড়িটার ওপর ছায়া পেতে রেখেছে! রাত্রিটা এবার ফুরোলে হয়।

আট

শেষ রাতের দিকে বৃষ্টি থামল। আকাশ অনেক হালকা হয়ে এলো। তবু চারপাশে ধোঁয়ার মতো শাদা জলকণার কমতি নেই। শীতকালে কুয়াশায় সমস্ত চরাচর ঢেকে ফেললে যেমন হয় অনেকটা ঠিক সে রকম।

শিবু আড়ষ্ট দেহটাকে টেনে তুলল। সমস্ত শরীরে কেমন যেন জং-ধরা ব্যথা। ঘাড়ের পাশে চিনচিন করে উঠল একবার। দু-একবার ঘাড় ঘুরিয়ে শরীরের জড়তা কাটাবার চেষ্টা করল শিবু। তারপর সামনের দিকে তাকাল। চারপাশ বেশ ফরশা। হয়তো ভোর হতে বিশেষ আর দেরি নেই। এখনি উচিত ওর বেরিয়ে পড়া। এখন থেকে হাঁটতে শুরু করলে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ও কাকদ্বীপে পৌঁছে যাবে। ওখানকার অবস্থা যতই খারাপ হোক, কাকদ্বীপের বাজার ও খোলা পাবেই। সেখানে পেট ভরে কিছু খেয়ে নিতে হবে। তারপর অবস্থা বুঝে যা হয় মেনে নেবে শিবু।

কিন্তু উঠোনের দিকে চোখ পড়তেই কেমন চমকে উঠল শিবু। এক হাঁটু করে জল জমে গেছে। এ জল বৃষ্টির না বানের বোঝার উপায় নেই। বৃষ্টিরই হবে হয়তো।

আলতো করে লাঠিটাকে তুলে নিল শিবু। আর এ সময় আবার টুনির কথা ওর মনে পড়ল। টুনি আর টুনির মা কি করছে এখন। একটু এগিয়ে ঘরের ভেতর উঁকি দিলেই শিবু ওদের দেখতে পেত। কিন্তু সাহসে কুলোল না। বরং ওরা টের পাওয়ার আগেই পালানো দরকার। পরের ঝামেলায় জড়িয়ে যাওয়ার সময় কোথায় এখন। ভীষণ স্বার্থপরের মতো ভাবল শিবু।

তারপর তড়িঘড়ি উঠোনে এক হাঁটু জলের মধ্যে নেমে পড়তেই

সারা গায়ে কাঁপুনি দিয়ে উঠল ওর। বাপরে কী ঠাণ্ডা। কিন্তু একটু পরেই এই ঠাণ্ডাটা গায়ে সয়ে যাবে। শিবু আর দাঁড়াল না। টিউব কলের পাশ দিয়ে এগিয়ে এসে সড়কে উঠল। অসম্ভব পেছল আর কাদা হয়ে আছে। লাঠি ঠুকে ঠুকে এগোতে লাগল শিবু।

গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠের দিকে পড়ল। পেছনে ভূতের মতো থমকে দাঁড়িয়ে আছে গ্রামের গাছগাছালি। আর সামনে সারা মাঠ জলে জলাকার। ধান-টান সব জলের তলায় তলানো। এ জল যদি দু-একদিনের মধ্যে না নামে, সর্বনাশা ফল দাঁড়াবে তবে। দেশে নির্ঘাৎ দুর্ভিক্ষ শুরু হবে।

শিবু দেখল, কাকদ্বীপের দিক থেকেও লোক আসতে শুরু করেছে। থোকায় থোকায় লোক। মাথায় বাক্সপেটরা। নারী, বৃদ্ধ, শিশু কি নেই। চোখে-মুখে অসম্ভব উত্তেজনা, অসম্ভব আতঙ্ক। ওদিকে যে আরো ভয়াবহ কিছু হয়েছে, তা ওদের মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

শিবু হঠাৎ একটু দাঁড়াল, আপনারা কাকদ্বীপ থেকে আসছেন?

—দেখতেই তো পাচ্ছ বাবা। মাঝবয়সী এক হাটুরে লোক মুখ বিকৃতি করে উত্তর দিল।

শিবু রাগল না, আবার শুধাল, কাকদ্বীপেই বাড়ি?

—না, কাকদ্বীপ ছাড়িয়ে আরো দক্ষিণে যেতে হয়। সাগরের কাছাকাছি।

লোকটা কথা বলতে বলতে ধুঁকতে শুরু করল। অসম্ভব ক্লান্ত। যেন দিন কয়েক ধরেই সমানে হাঁটছে আর হাঁটছে। হয়তো ভীষণ ক্ষুধার্তও। কিন্তু ওসব কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না শিবুর। শুধোল, আমি মন্দিরতলার দিকে যেতে চাই, রাস্তা পাব কিনা বলতে পারেন?

—মন্দিরতলা। যেতে যেতে জল নেমে যেতে পারে। জল না নামলে অসম্ভব। লোকটাও সংক্ষেপে উত্তর সারল।

সঙ্গের মহিলাটি বলল, জলও কি জল। তাল গাছ ডুবে যায় এমনি জল হয়েছিল। ও জল কি এত সহজে নামে! আমার তো মনে হয়, আরো কয়েকদিন না গেলে যাওয়া যাবে না।

লোকটা বলল, যাও না, গেলেই দেখতে পাবে গাছের মাথায় নৌকো উঠে আছে। বাপের জন্মে বাপু এমন জল দেখি নি আমরা।

পেছন থেকে আরো কিছু লোক এসে পড়েছিল। শুধাল, কি হয়েছে কর্তা?

—না, কিছু না। মন্দিরতলার দিকে যেতে পারব কিনা জিজ্ঞেস করছিলাম।

—মন্দিরতলা কেন, কোন তলাতেই যাওয়া ঠিক নয়। রাস্তায় রাস্তায় মড়া পচে ফুলতে শুরু করেছে।

গা ঝাঁকি দিয়ে উঠল শিবুর।

—দুর্গন্ধে তোমার নাড়িভুঁড়ি উলটে আসবে গো।

আর একজন বলল, ওদিককার কোন গ্রামেই আর গরু ছাগল বেঁচে নেই। কোনটা গরু কোনটা ছাগল আর কোনটা মানুষ চিনতেই পারবে না বাপু।

শিবুর শরীরের মধ্যে কেমন যেন ঝিমুনী শুরু হল। মুহূর্তের মধ্যেই কেমন যেন লোকগুলি ঝাপশা হয়ে উঠল ওর চোখের সামনে। নিজের দেহটাকে সামলে রাখার সব ক্ষমতাই যেন লোপ পেয়ে গেল শিবুর। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, টলতে টলতে পা মুড়ে কাদার ওপরই বসে পড়ল শিবু।

—ওমা গো! লোকটা অমন করছে কেন গো! কে যেন এগিয়ে এসে শিবুর গায়ের ওপর হাত রাখল, ও বাবু! কি হল গো তোমার?

শিবু হাত-পা নাড়ার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছিল। কেবল চোখের সামনে ঝাপশা-ঝাপশা মুখ। ওপরের খোলা আকাশটা যেন

ভারি হয়ে ওর মাথার ওপরই নেমে এসেছে। নিচে কাদার ওপর দেহটা যেন টলছে। ভূমিকম্প হচ্ছে না তো।

—ও বাবু! মর জ্বালা। কি হয়েছে বলবে তো?

কে যেন খানিকটা কাদা-জলই ওর ঘাড়ে গলায় বুলিয়ে দিল। তারপর কাঁধ ধরে বার কয়েক ঝাঁকি দিল ওকে।

কতক্ষণ যে ঐ সব হল কে জানে, আবার অতল অন্ধকার থেকে ভেসে উঠল শিবু। ধীরে ধীরে আবার সম্বিৎ ফিরে পেল ও।

—এই বাবু?

শিবু উত্তর করল, উঁ।

—কি হল? কি হয়েছে তোমার?

—কিছু না। শিবু কেমন কৃতজ্ঞতায় তাকিয়ে থাকল লোকগুলির দিকে। এমনি মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল।

—কোত্থেকে আসছ তুমি?

শিবু অপরাধীর মতো বলল, গাইগাছি। এমন যে দুর্যোগ হবে বুঝতে পারি নি।

—তা ওদিক থেকে বেরুলে কেন? গাইগাছির দিকে তো বান হয় নি শুনেছি?

শিবু বলল, গাইগাছি গিয়েছিলাম কাজে। আসলে আমার বাড়ি মেদিনীপুর চন্দনতলা। বোধহয় বাড়ির কথা ভাবতে গিয়েই কেমন যেন একটু হয়ে গিয়েছিলাম।

—শোন কথা। অতবড় সোমত্থ ছেলে, তার কথা শোন।

পেছন থেকে কে যেন তাড়া লাগাল মহিলাটিকে, ও তারার মা, চল চল, বেলা হয়ে যাচ্ছে। আমাদের অনেক দূর যেতে হবে।

—হ্যাঁ বাবু। অনেক বেলা হয়ে যাচ্ছে, আমরা এগোই। তুমি বাপু সাবধানে যেও। বান যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন ধীরে ধীরে এগোও, ঠিক বাড়ি পৌঁছে যাবে।

মহিলাটি আর দাঁড়াল না। ওর দলবল সঙ্গী-সাথীরা সত্যি সত্যি

অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। শিবু কৃতজ্ঞতায় মহিলাটির দিকে তাকিয়ে আরো অনেকক্ষণ ঐভাবে বসে থাকল। তারপর উঠে দাঁড়াল। ওকেও এগোতে হবে। যেভাবেই হোক, ওকেও চন্দনতলা গিয়ে পৌঁছতে হবে।

শিবু আবার এগোতে শুরু করল। রাস্তা না বলে কাদার সমুদ্র বলাই ভাল। আঁটাল কাদা পায়ে কামড়ে ধরে পাটাকে ভারি করে তুলছে। ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে পা থেকে কাদা না ছাড়ালে চলাই দায়। তবু ভাল, সেই লোকটা ওর লাঠিটাকেও চুরি করে নিয়ে পালায় নি তখন।

কিন্তু শিবুর অমন অজ্ঞান হওয়ার মতো অবস্থা হল কেন তখন! শিবু কি সত্যি সত্যি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে! মনে পড়ল, কাল সারাটা রাত কেটেছে না খেয়ে, না ঘুমিয়ে। মনে পড়ল, অন্ধকার শেষ হতে না হতেই শিবু ঐ স্কুল বাড়ির চৌহদ্দি থেকে পালিয়ে এসেছে। আসতে বাধ্য হয়েছে শিবু। ঐ টুনির চোখদুটো আবার ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। মেয়েটাকে কি এখনো আগলে বসে আছে ওর মা! এতক্ষণে তো টুনির শরীরে পচন ধরার কথা।

চুলোয় যাক, হাজার হাজার লোক যেখানে মরে যাচ্ছে, সেখানে ঐ একটা মৃত্যুকে নিয়ে ও মিছিমিছি ভেবে মরবে কেন! মন থেকে ও টুনির চোখদুটো মুছে ফেলার চেষ্টা করল। আবার এগোতে শুরু করল শিবু। আকাশের চেহারা দেখে মনে হল, আবার রোদ উঠতে পারে। অল্প অল্প বাতাস বইছে। ফাঁকা মাঠের মধ্যে সব সময়ই বোধহয় এরকম বাতাস বয়। কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে শিবুর সারা শরীর ঘেমে উঠল। গায়ে, জামা কাপড়ে কাদার ছোপ। কাদা আর জল এখন যেন খুব স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে ওর কাছে। চন্দনতলা অবধি না পৌঁছতে পারলে এই বেশ আর ছাড়বার কোন উপায়ও নেই ওর।

পথের দু-ধারেই কিছু না কিছু লোক-বসতি। কখনো বা

বসতিহীন ফাঁকা মাঠ। বহু দূরে দূরে গ্রামের চিহ্ন। কাকদ্বীপ আর কত দূরে কে জানে!

আবার লোক আসছে দেখতে পেল শিবু। শুধোল, কাকদ্বীপ আর কতদূর দাদা?

—ক্রোশখানেক। লোকটা কথা বাড়াল না। শিবুকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

শিবু আবার হাঁটার গতি বাড়াল। ক্রোশখানেক বলতে মাইল দুয়েক। খুব বেশি হলে আরো ঘণ্টাখানেকের পথ। কেমন যেন জোর পেল মনে। পকেটেব টাকাগুলো এখনো পকেটেই রয়েছে। যেভাবেই হোক কাকদ্বীপে একবার পৌঁছতে পারলে ওর প্রথম কাজই হবে পেট পুরে খেয়ে নেওয়া। তারপর অবস্থা বুঝে যা হোক।

কাকদ্বীপ পৌঁছলে চেনাশোনা কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। যদি দেখা হয়, শিবু বেঁচে যায়। অন্তত মেদিনীপুরের দিকে কতদূর কি ঘটেছে জেনে যেতে পারে শিবু।

উত্তেজনায় আবার কেঁপে ওঠে শিবু। আপাতত ওর একটাই লক্ষ্য, কাকদ্বীপ। যেভাবেই হোক কাকদ্বীপের বাজারে গিয়ে পৌঁছতে পারলে হয় একবার। হাঁটার গতি বেশ বাড়িয়ে দিল শিবু। প্রায় ছুটতেই শুরু করল।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হল আবার। রাস্তার একপাশে ঢালের দিকে বেশ কিছু শেওড়ার ঝোপ। সেই ঝোপের একপাশে কি ওটা! চমকে উঠল শিবু। একটা মানুষ বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু অমনভাবে কাদায় মাখামাখি হয়ে কি করছে লোকটা।

শিবু নড়তে পারল না। সত্যি সত্যি কি ওটা মানুষ, না অন্য কিছু। হ্যাঁ, মানুষই। সর্বাঙ্গে কাদা মাখা। কাদার মধ্যে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

শিবু ডাকল, ও মশাই? কে আপনি?

মূর্তিটা থমকে গেল। তারপর হাঁউমাউ করে ককিয়ে উঠল,

আমাকে বাঁচান। আমি চোখে দেখতে পাই না বাবু। এই কাদায় এসে আছড়ে পড়েছি, আমাকে বাঁচান।

শিবু কি করবে বুঝতে পারল না। লোকটাকে কাদা থেকে টেনে তোলা উচিত। কিন্তু সত্যি সত্যি যদি লোকটা অন্ধ হয়ে থাকে, কাদা থেকে তোলার পর তো ওরই সঙ্গে লেগে থাকতে চাইবে।

শিবু আবার শুধাল, অন্ধ তো ঐ কাদার মধ্যে গেলে কেন? কোথায় বাড়ি তোমার?

লোকটার মাথায় অবধি জবজব করছে কাদা। মুখে ঘাড়ে গলায় সারা গায়ে কাদা। পরনে কোন অঙ্গবাস আছে কিনা বোঝার উপায় নেই।

—আমাকে বাঁচান। বানের জলে ভাসতে ভাসতে এখানে এসে পড়েছি। আমাকে কাকদ্বীপে এগিয়ে দিন বাবু। আপনার পায়ে পড়ি।

শিবুর কেমন করুণা হল। কাকদ্বীপ যাবে? ওখানেই বাড়ি নাকি?

লোকটার চোখদুটো শাদা ঘষা পাথরের মতো মনে হল শিবুর। সত্যি সত্যি অন্ধ যে সন্দেহ নেই।

একটা হাত এগিয়ে রেখেছে লোকটা। আমাকে বাঁচান বাবু। আপনার পায়ে পড়ি। সংসারে আমার কেউ নেই।

শিবু এগিয়ে এল। লোকটার হাত ধরল। ওঠো। কোথায় বাড়ি তোমার?

—বাড়িঘর কিছুই নেই বাবু।

—নেই। মানে? কোথায় থাকো তাহলে? কি কর?

লোকটা শিশুর মতো ডুকরে উঠল, আমি অন্ধ নাচার বাবু, ভিক্ষে করে খাই।

শিবু বুঝল, লোকটা ভিখিরি। কিন্তু ভিখিরি হোক আর যাই

হোক, মানুষ তো! বলল, দাঁড়াও, নদীর দিকে চল আগে। গায়ের কাদা-টাদা ধুয়ে নাও।

হাত ধরে টেনে টেনে লোকটাকে নদীর দিকে নিয়ে এল শিবু। নাও, গা হাত পা আগে পরিষ্কার কর। ধুয়ে নাও।

লোকটা হাতড়ে হাতড়ে নদীর জলে খানিকটা নেমে পড়ল। গায়েব কাদা ধোবার জন্য জলে ডুব দিল। তারপর আবার উঠে দাঁড়াল।

শিবু দেখল, লোকটার কোমরে একটা নেংটি ছাড়া কিছুই নেই। গায়ে এখনো চাপ-চাপ কাদা। সঙ্গে সঙ্গে ভেবে দেখল, কিই বা হবে ওসব পরিষ্কার করিয়ে। লোকটাকে হাত ধরে টেনে টেনে কাকদ্বীপ অবধি নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। ববং শিবুবই উচিত, কেটে পড়া।

লোকটা আবার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ঘষা পাথরেব মতো চোখ। কিন্তু কী আকুতি।

—বাবু! লোকটা করুণ গলায় ডাকল।

শিবুব কি উচিত পালিয়ে যাওয়া! বুঝতে পারল না। সব মানুষই তো এ সময় স্বার্থপব হয়। শিবুরও কি উচিত স্বার্থপর হয়ে নিজের পথ আগে বেছে নেওয়া।

—বাবু! আবার ডাকল লোকটা।

শিবু উত্তর না দিয়ে পারল না, কি হল?

—আমাকে কাকদ্বীপ বাজারে পৌঁছে দিন বাবু। এর আগে কত চেঁচিয়েছি, কেউ আমাকে কাদা থেকে তুলে ধরে নি। ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন গো।

—কাকদ্বীপ বাজার কি এখানে? অতদূর তোমায় কে পৌঁছে দেবে? কাব অত সময় আছে এখন?

—বাবু! আবার ডুকরে উঠল লোকটা। দু-দিন ধরে আমি না খেয়ে আছি বাবু। আমাকে বাজারে পৌঁছে দিন। ওখানে কেউ না কেউ আমাকে দুটো খেতে দেবে।

—হ্যাঁ, সবাই তোমার জন্য খাওয়া নিয়ে বসে আছে কি না! তোমাকে আমি রাস্তায় তুলে দিচ্ছি। তারপর তোমার কপাল।

লোকটা অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইল। পৃথিবীর অনন্ত রহস্য ঐ চোখে।

—কই এসো।

লোকটাকে টেনে টেনে রাস্তায় তুলে আনল শিবু। কিন্তু লাঠি ছাড়া এ রাস্তায় হাঁটা অসম্ভব। জলজ্যান্ত দুটো চোখ থাকতেও শিবু লাঠি ছাড়া এগোতে পারছে না, আর ও তো অন্ধ।

শিবু একবার ভাবল, লাঠিটা ওর হাতে ধরিয়ে দিলে কেমন হয়। কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার ও নিজেকে সংযত করল। না অসম্ভব! লাঠিটা কিছুতেই হাতছাড়া করা উচিত হবে না ওর। এখানে স্বার্থপর না হলে শিবু নিজেই মারা পড়বে।

বলল, এবার সামনের দিকে হাঁটতে থাক। আর মাইলখানেক হাঁটলেই কাকদ্বীপ পেয়ে যাবে।

শিবু ওর হাত ছেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা অকূল অন্ধকারে আবার হাত বাড়িয়ে শিবুকে ধরবার চেষ্টা করল। কিন্তু শিবু ততক্ষণে দু-পা সরে দাঁড়িয়েছে।

—বাবু!

শিবু উত্তর করল না।

—বাবু! লোকটা প্রাণপণে চিৎকার করে উঠল।

শিবু নিঃশব্দে চোরের মতো পা ফেলে ফেলে ছুটতে শুরু করল কাকদ্বীপের দিকে।

নয়

সারাটা রাস্তায় মনে হল, লোকটার ঐ ঘোলাটে চোখদুটো যেন ওর সঙ্গে সঙ্গে আসছে। শিবুকে কিছুতেই রেহাই দেবে না ঐ চোখদুটো। শিবু মনের ভুলে কয়েকবার লোকটার ডাক শুনে পেছন দিকে তাকিয়েও দেখল। কিন্তু না, পেছনে ধু-ধু করছে পথ। একটা ছিটেফোঁটা মানুষও আর চোখে পড়ে নি ওর।

প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে বাকি পথটুকু পার হয়ে এল শিবু। এক-সময় চোখের ওপর ভেসে উঠল কাকদ্বীপ। হ্যাঁ, ঐ তো কাকদ্বীপ। অসংখ্য মানুষের ভিড়ে জমজমাট মনে হল জায়গাটাকে। কিন্তু এ কেমন কাকদ্বীপ! যে কাকদ্বীপকে ও চিনত, দিন দু-তিনেক আগেও যে কাকদ্বীপের ওপর দিয়ে ও গাইগাছি গিয়েছিল, সেই কাকদ্বীপেই কী ও এসে পৌঁছল!

বাজারের দিকটা ওর চেনা। কিন্তু বিরাট একটা গাছ মুখ থুবড়ে পড়ে পথ আগলে রেখেছে। গাছের ভেতর দিয়েই রাস্তা করে এগোতে হবে ওকে। আর অপেক্ষা করল না শিবু, গাছের ডালপালাব ভেতর দিয়ে কষ্ট-কসরত করে বাধাটুকু পার হয়ে এল। এপারে এসে আবার থমকে দাঁড়াল। সামনে বাজারের দিকে গিসগিস করছে মানুষ। কিন্তু ওপাশে কয়েকটা ঝুপড়ি ছিল না? শিবু দেখল, ঝুপড়িগুলো মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। জায়গাটা প্রায় সমতল হয়ে গেছে। যারা ওখানে থাকত, তাদের কি হল! নাকি ঝড়ে তাদেরও উড়িয়ে নিয়ে গেছে! ভাবতেই কেমন অদ্ভুত লাগল ওর।

যাই ঘটে থাক না, এখন আর কারো জন্য ভাববার সময় নেই। শিবু এগোতে শুরু করল বাজারের দিকে। বাজারের দিকেই ভিড় বেশি। ওদিকেই যত মানুষ হামলে পড়েছে। এত মানুষ কোত্থেকে

যে রাতারাতি এসে হাজির হল, কে জানে! কোথাও কোন মেলা বসলেও এত ভিড় হয় না। তাছাড়া সবাই যেন ধুঁকছে। সবাই যেন প্রচণ্ড খিটখিটে হয়ে রয়েছে। পরনে জামা-কাপড় আছে কি নেই, সে খেয়ালও নেই কারো। কেউ কেউ জটলা পাকিয়ে কাদা মাটির ওপরই বসে পড়েছে। ঐ স্যাঁতসেতে মাটিতেই শুয়ে পড়েছে কেউ কেউ। মানুষ আর জানোয়ারে পার্থক্য কোথায়!

এক অবর্ননীয় দৃশ্যের সামনে এসে দাঁড়াল শিবু। বুকের ভেতর কাঁপুনি শুরু হল ওর। এই ভিড়ের মধ্যে এখন কি করবে শিবু! কে কার জন্য মাথা ঘামাবে এখানে!

মনে পড়ল, রাস্তার লোকগুলি ওকে ঠিকই বলেছিল, কাকদ্বীপ এখন নরক। আর ওখানে যে মানুষগুলি এসে জড়ো হয়েছে তারা নরকের কীট ছাড়া কিছুই নয়। সত্যি সত্যি চোখে না দেখলে এ দৃশ্য ভাবা যায় না।

কি যে করবে বুঝতে পারছিল না শিবু। এত ভিড় অথচ একটা চেনামুখও যদি ওর চোখে পড়ে! আঁতিপাতি করে ভিড়ের মধ্যে চেনা-মুখ খুঁজতে শুরু করে শিবু।

হঠাৎ চমকে উঠল। ওপাশে প্রচণ্ড চেঁচামেচি ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। কি হল ওদিকে! কি ব্যাপার! শিবু না এগিয়ে পারল না। এগিয়ে জটলার মধ্যে ঢুকে পড়ল। অবাক হয়ে দেখল, একটা দশাসই মদ্দ যোয়ানকে বোলতার মতো ছেঁকে ধরেছে কয়েকজন। সে এক অমানুষিক দৃশ্য! লোকটাকে সবাই মিলে পিটতে শুরু করেছে। যে যেভাবে পারছে কিল-চড়-ঘুষি চালিয়ে যাচ্ছে। লোকটাও প্রাণপণে বাঁচার চেষ্টা করছে।

কি করেছে লোকটা! চুরি না রাহাজানি! সেই চোরটাই নয় তো! না, সে নয়। লোকটা চিৎকার করে কি যেন বলছে বোঝা যাচ্ছে না। ওর মুখ ফেটে দরদর করে রক্ত বেরুতে শুরু করেছে। কে যেন ওর ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে খামচে এক মুঠো

চুল ছিঁড়ে নিয়ে এল। ইস্, ভাবা যায় না। গা শিউরে উঠল শিবুর। হাত-পা কেমন অবশ হয়ে এল।

—কি হয়েছে দাদা?

যাকে জিজ্ঞেস করল, সেও কেমন করুণ চোখে দৃশ্যটা দেখছিল। বলল, চুরি করেছে বোধহয়। কিন্তু যাই করুক, এভাবে মারাটা উচিত হচ্ছে না। লোকটাকে ওরা মেরেই ফেলবে।

মারের দৃশ্য দেখে শিবুর আর এগোতে সাহস হল না। ওপাশ থেকে কে একজন বলল, চোর নয়, চোর নয়, চোর হলে বুঝতাম, পেটের জন্য করেছে। কিন্তু ও শালার নরকেও ঠাঁই হবে না।

—কি করেছে তাহলে? শিবু আর কৌতুক দমিয়ে রাখতে পারল না। আবার জিজ্ঞেস করল।

লোকটা বলল, ভাবতে পারেন, ও শালা সারারাত একটা মেয়েকে নিয়ে ফুর্তি করেছে। সকালবেলা মেয়েটাকে পয়সাকড়ি না দিয়েই পালিয়ে যাচ্ছিল। পয়সাও দেয় নি, অথচ চোটপাট কত।

শিবু বুঝল, নোংরামি ব্যাপার। কাকদ্বীপে নাকি এসব ব্যাপারে বদনামও আছে, কিন্তু কোনদিনই চাক্ষুস দেখে নি শিবু। ও সব দেখার কথা কোনদিন ওর মাথাতেও আসে নি। কিন্তু যাই করে থাক লোকটা, ওভাবে মারলে ও মরে যাবে যে।

শিবু আর দাঁড়াল না। এ দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। লোকটাকেও বলিহারি, চারিদিকে এত প্রলয়, এর মধ্যে ও ধরনের রুচিই বা হয় কি করে!

এমন সময় হঠাৎ আবার ফুল্লরার কথা মনে পড়ল শিবুর। কেমন গুটিয়ে এল ও। ফুল্লরাও তো গতকাল রাতে ঐ ঝড়-বাদলের মধ্যে···না, শিবু মনে মনে বলল, আমার কি দোষ! আমি তো আর ডেকে আনি নি ওকে। বরং আমি চেয়েছিলাম ফুল্লরা চলে যাক। আমাকে একা থাকতে দিক।

ধরা যাক, ওসময় যদি পাড়ার লোক টের পেয়ে যেত, ফুল্লরাকে

নিয়ে আমি—তবে কি এই লোকটার মতো আমার ওপরও ঝাঁপিয়ে পড়ত সবাই। তবে কি—

ধুত। আমার কি দোষ! আমি যদি ফুল্লরাকে আগে থেকে জানতাম, তবে কি রাত কাটাবার জন্য ও বাড়িতে যাই। অসম্ভব, কক্ষনো যেতাম না আমি। জীবনে আর গাইগাছি না। যেভাবে বেঁচে এসেছি, আর কক্ষনো না। কোন দিন না।

শিবুর মনে হল, ও খুব ভাগ্যবান, ঐ রাক্ষুসী মেয়েটার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে পেরেছে ও।

আরো কিছু দূর এগিয়ে এল শিবু। একটা গাছতলায় অনেকগুলি সংসার বসে পড়েছে। কোথা থেকে লোকগুলি এল কে জানে। কেউ কেউ ওরই মধ্যে হাঁড়ি চড়িয়ে দিয়েছে। কেউ কেউ জলে কাদায় মাখামাখি হয়ে শুয়ে পড়েছে। ঐ স্যাঁতসেতে কাদার ভেতর কিভাবে যে শুয়ে আছে, কে জানে।

শিবু না-দেখি না-দেখি করে এগিয়ে গেল। সামনেই বাজার। হ্যাঁ, ঐ তো বাজার। কিন্তু বেশির ভাগ ঝাঁপই বন্ধ। কেউ কি খোলে নি নাকি! দু-একটা খোলা দোকান যা দেখা যাচ্ছিল ভেতরে তার জিনিস বলতে কিছুই নেই। কারা যেন ঝেড়েপুছে সব কিছু পরিষ্কার করে নিয়ে গেছে। হোটেলগুলির চেহারা আরো সঙ্গীন। তছনছ করা অবস্থা একটা হোটেলের সামনে এসে শিবু দেখল, ভেতরে জনা তিন চারেক লোক। হয়তো দোকানেরই লোক। শিবু ভেতরে ঢুকে পড়ল।

—কি চাই? দোকানের ভেতর থেকে কে একজন খেঁকিয়ে উঠল।

শিবু করুণভাবে বলল, একটা 'মিল' চাই দাদা? কাল থেকে না খেয়ে আছি।

—বেরন, বেরন বলছি। লোকটা ওকে এই মারে তো সেই মারে।

শিবুও রুখে দাঁড়াল, ভদ্রলোকের মতো কথা বলুন, আমি ভিক্ষে চাইতে আসি নি, পয়সা দিয়ে খাব।

—ফের ঝামেলা করে। লোকটার এক কথা, বেরন বলছি। কোথায় ছিলেন এতক্ষণ, দোকানটা যে লুট হল, কোথায় ছিলেন আপনি ?

—লুট।

দোকানদার আবার হা-হা করে উঠল, যান, ভেতরে গিয়ে দেখুন, উনুনের ছাই অবধি লুট করে নিয়ে গেছে।

—কারা ? কখন ?

লোকটা আবার দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠল, আপনি বেরবেন কিনা বলুন ?

শিবু বুঝল, লোকটার মাথার ঠিক নেই। এখন কারোরই মাথা ঠিক রাখার অবস্থা নেই। লোকটার সত্যি সত্যি বিরাট ক্ষতি হয়ে গেছে। বেচারা !

আবার ফিরে এল শিবু, লোকটার ক্ষতি হয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু কারো কারো তো উপকারও হয়েছে। কত লোক তো ওরই মতো না খেয়ে আছে, তাদের কারো কারো দু-এক মুঠো করে হয়তো লুটের ভাত পেটে পড়েছে। পৃথিবীটা বড় তাজ্জব জায়গা, একদিকে ক্ষতি একদিকে লাভ। দাঁড়িপাল্লাটা যেন সমানভাবে ঝোলে। ছেলেবেলায় ও ভূগোল বইয়ে পড়েছিল, নদীতে বান হলে জমির উর্বরা শক্তি বাড়ে, জমির উর্বরা শক্তি বাড়লে ফসল ভাল হয়, লাভ বৈ কি ! বানে লাভও হয় ক্ষতিও হয়। তবে কি, এবার এই যে বান হল, এতে আগামীবার থেকে ডবল ধান হবে। অসম্ভব এ-সব নদী পলি বিছোবার বদলে বিছোয় কেবল নুন। সেই নুন জমিকে দেয় পুড়িয়ে। হয়তো দেখা যাবে, কয়েক বছর আর ধানই হচ্ছে না। এবারকার এই বন্যায় ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই।

আরো কয়েকটা খাবার দোকান চোখে পড়ল শিবুর। ঝাড়া-পোঁছা। ঘরের বেড়াগুলো কেবল খুলে নিয়ে যেতে বাকি। কেমন হতাশ লাগল শিবুর। এই কাকদ্বীপেই যদি ও খাবার না পায়,

আর কোথায় পাবে তাহলে। পকেটে টাকা রয়েছে, কিন্তু এই মুহূর্তে শিবুর মনে হল, টাকার কি দাম, কেবল কয়েক টুকরো কাগজ ছাড়া ও-গুলোর কোন দাম নেই। কি হবে এই টাকায়!

বাজারের ভেতরে এপাশে-ওপাশে গলিঘুঁজির মধ্যে কিছুক্ষণ ঘুরে হঠাৎ আবার থমকে দাঁড়াল, ঐ তো ঝাঁপ বন্ধ করা একটা হোটেল। ওর সামনে টুলের ওপর মোটা থলথলে একটা লোক বসে আছে। লোকটাকে কেমন সন্দেহজনক মনে হল ওর। ঐ লোকটাই বোধহয় হোটেলের মালিক।

শিবু এগিয়ে এল, ও দাদা কিছু খাবার পাব না? কাল থেকে না-খেয়ে আছি।

লোকটা একপলক শিবুর দিকে তাকায়, ভঙ্গিটা কেমন রহস্যময়।

—ভাত না হয় নাই হল, চিড়েমুড়ি কিছু পাব না?

লোকটা প্রশ্ন করে, কোথায় যাওয়া হবে শুনি?

শিবু বলল, মন্দিরতলা যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, সেখান থেকে অবস্থা বুঝে চন্দনতলা। চন্দনতলায় আমার বাড়ি।

—কোথা থেকে আসা হচ্ছে? লোকটার যেন সন্দেহ কাটছে না।

শিবু আবার বিনীতভাবে উত্তর দিল, গোশিঙা গাইগাছি। একটা কাজে গিয়েছিলাম, গিয়ে কী বিপদেই যে পড়েছি, তা বলে বোঝানো যাবে না।

—তা বাপু, ওদিক থেকেই যখন এলে, সঙ্গে কিছু চাল নিয়ে আসতে পারলে না। এখন মাঠের ঘাস চিবোও গে যাও।

শিবু বলল, চিড়ে নিয়ে বেরিয়েছিলাম, পথে চুরি হয়ে গেছে। সে শালা এক হারামজাদা আমাকে চোট দিয়ে কেটে পড়েছে।

—বেশ হয়েছে। এবার তুমিও কাট দেখি দেখছ তো দোকানে কিচ্ছু নেই।

শিবু নাছোড়বান্দা, লোকটা হয়তো খদ্দের বুঝে গোপনে গোপনে

মাল ছাড়ছে। এর পেছনেই লেগে থাকবে শিবু। একেই তোষামোদ করে কিছু আদায় করতে হবে।

—কি হল, বললাম তো নেই।

—নেই তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু দাদা, কাল থেকে না-খেয়ে আছি। একটু দয়া না করলে একদম মরে যাব।

লোকটা এবার চারপাশে তাকিয়ে ফিসফিস করে শুধায়, পয়সাকড়ি আছে?

শিবু আশার আলো দেখতে পেল, নইলে কি মাগনা খেতে এসেছি! পয়সা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি অথচ খাবার নেই, এব চেয়ে দুঃখের আর কি থাকতে পারে বলুন!

—ঠিক আছে, দশ টাকা ছাড়ো। ডাল আর ভাত পেটপুরে খেতে দশ টাকা লাগবে।

—দশ টাকা! শিবু চমকে ওঠে। দশ টাকা কেন, টাকা পাঁচ-সিকেয় তো গলা অবধি খাওয়া যায়। বিপদে পড়েছি বলে যা ইচ্ছে তাই দিতে হবে নাকি!

—কেটে পড় দেখি। ঝামেলা পছন্দ করি না, কেটে পড়।

শিবু আবার গুটিয়ে গেল, মিন-মিন করে বলল, যা রেট তাই দেব, না হয় এক টাকা বেশি দেব সময় খারাপ বলে, ওরকম করা উচিত নয় আপনাদের।

—বললাম তো বাবা, খুঁজে দেখ, কেউ যদি দেয়, খেয়ে নাও। আমার এখানে নেই।

শিবুর ইচ্ছে হল, লোকটির মুখে একটা ঘুষি চালিয়ে দেয়। কিন্তু তাতে আরো ঝামেলায় জড়াতে হবে। চন্দনতলার খবর যতক্ষণ না পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ আব ঝামেলায় যাবে না শিবু। একটুক্ষণ থমকে থেকে বলল, ঠিক আছে, তাই দেব, দিন।

—আগে টাকা, পরে কথা। লোকটা হাত এগিয়ে ধরে।

শিবুর মনে হল, নিয়ম-কানুন সব কিছু যেন পালটে গেছে

পৃথিবীর। এর আগে কে কোথায় শুনেছে যে হোটেলে খাবার আগেই পয়সা দিতে হয়। শেষপর্যন্ত ওর টাকা দশটাই মেরে দেবে না তো! কার মাথায় যে কোন শয়তান ঘুরছে কে বলবে!

কিন্তু পরক্ষণেই ওর মনে হল, টাকার কি দাম! লোকটা যদি আবার বেঁকে বসে। তবু যা হোক, খাওয়াতে রাজি হয়েছে, দশটা টাকা বৈ তো নয়! শিবু পকেট হাতড়ে অনুমানে দশ টাকার নোটটাই টেনে বার করল, এই নিন, আমরা ছোটলোক নই যে টাকাটা মেরে দিয়ে পালিয়ে যাব। নেহাৎ বিপদে পড়েছি, তাই।

লোকটার চোখদুটো চকচক করে ওঠে, রাগ করো না ভাই, ভদ্রলোক ছোটলোক গায়ে লেখা থাকে না। টাকাটা নেড়েচেড়ে ওপরে তুলে নিচে নামিয়ে দেখে নিল। হয়তো বুঝবার চেষ্টা করল, টাকাটা আসল না নকল। তারপর একগাল হেসে টাকাটাকে যত্ন করে ট্যাঁকে গুঁজল, এসো।

দু-তিনটে ঘরের পাশ দিয়ে একটা অন্ধকার মতো জায়গায় নিয়ে এল শিবুকে। গা ছমছম করে উঠল শিবুর। বিশ্রী আঁশটে গন্ধ নাকে লাগল। কিন্তু চট করে বাইরের লোকের বোঝার উপায় নেই, এখানে হাঁড়ি ভর্তি ভাত আর বালতি ভর্তি ডাল রাখা আছে। আজকেরই রান্না, না কালকের কে জানে! কিন্তু যখনকারই হোক আপাতত খাওয়া জুটছে এই যেন শিবুর ভাগ্য। কড়কড়ে ঠাণ্ডা ভাত, পাতলা জলের মতো ডাল, গোগ্রাসে খেয়ে ফেলল শিবু।

লোকটা বলল, এই আমার শেষ ভাত। এটা ফুরিয়ে গেলে একশ টাকা ঢাললেও আর পাওয়া যাবে না। তাছাড়া কি জানো, আমি নিজে না খেয়ে তোমাকে খাওয়ালাম। টাকাটা কি আর এমনি নিচ্ছি!

শিবু কি বলবে ভেবে পেল না। একদিকে বন্যায় ব্যতিব্যস্ত মানুষ, আর অন্যদিকে চাল ডাল তেল নুন সব উধাও। এরপর মানুষের মাংস মানুষে খাবে।

খেল বটে, তবে লোকটার দিকে তাকাতে ঘেন্না হচ্ছিল শিবুর। কিন্তু উপায় নেই, এই পৃথিবীর নিয়মই এরকম।

—কি গো বাবু, খুশি তো! লোকটা যেন কৃতার্থ করেছে শিবুকে।

শিবু কথার উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

অগণিত মানুষ চারপাশে, অসম্ভব ব্যস্ততা সবার। দশ টাকা খরচ করে ক-জন লোক ওর মতো ভাত খেতে পেরেছে কে জানে! নিজেকে স্বার্থপর মনে হল শিবুর। এতগুলো লোক যেখানে না-খেয়ে আছে, সেখানে ওরও না-খাওয়াই উচিত ছিল।

পরমুহূর্তেই আবার মনে হল, ও যদি না খেয়ে থাকত, তাহলে যারা না-খেয়ে আছে তাদের কি কিছু সুরাহা হত! হত না, অসম্ভব; বরং একটা লোকই খেয়ে বাঁচল, সেই বা কম কী!

শিবু আকাশের দিকে তাকাল, আকাশ অনেক পরিষ্কার হয়ে এসেছে। কিন্তু এখনো রোদের মুখ দেখা যাচ্ছে না। না গেলেও এ অবস্থা চলতে থাকলে বিকেলের মধ্যেই সব মেঘ কেটে যেতে পারে। হে ভগবান, আর যেন বৃষ্টি-বাদলা না হয় গো! এবার সবাইকে রেহাই দাও। দোহাই তোমার।

লাঠিটা এখন নিষ্প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছিল। আশেপাশে স্যাঁতসেতে কাদা থাকলেও অনেকটা শুকিয়ে এসেছে। এ অবস্থায় লাঠি ছাড়াই চলা যায়। কিন্তু লাঠিটাকে এখনি হাতছাড়া করা উচিত নয়। কে জানে, কচুবেড়ের দিকে এখনো কি অবস্থা চলছে!

শিবু আর সময় নষ্ট না করে এবার ঘাটের দিকে এগোতে থাকে। ঘাটে ফেরি চলছে কি না কে জানে! ফেরি না চললে ডায়মণ্ডহারবারের দিকে এগোতে হবে। তাহলে, আরো দু-দিনের ধাক্কা। তাছাড়া যে দিক দিয়েই যাক ও, ফেরি পারাপার হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

খানিকটা এগিয়েই আবার থমকে দাঁড়ায়, মুখে গাঁজলা ছড়িয়ে

আঠারো-বিশ বছরের একটা মেয়ে মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে। কি হয়েছে মেয়েটার। অনেকেই মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু কেউই সাহায্য করার জন্য এগোচ্ছে না, শিবুর কেমন খারাপ লাগে।

—কি হয়েছে ভাই?

অল্পবয়সী একটা ছোকরাকেই বোধহয় জিজ্ঞেস করেছিল ও। ছেলেটা শিবুর দিকে তাকাল, কলেরা।

—কলেরা। শিবু চমকে ওঠে। সঙ্গে আর কেউ নেই?

ছেলেটা বলল, কলেরা হয়েছে দেখে সবাই ওকে ফেলে পালিয়ে গেছে। মেয়েটা বাঁচবে না। কেবল ওরকম করছে।

—বাঁচবে না। শিবুর আবার টুনির কথা মনে পড়ল। টুনির চেয়ে এ মেয়েটা বয়সে কিছু বড়। কিন্তু মেয়েটা চোখ বুজে আছে। টুনি ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে ছিল। টুনির চোখদুটোর কি অবস্থা এখন! টুনিকে কি এখনো ওর মা আগলে বসে আছে। কি জানি, মানুষের মতো বিচিত্র জীব আর কি আছে পৃথিবীতে।

কলেরা বলেই আর এগোতে সাহস হল না শিবুর। ভীষণ ছোঁয়াচে রোগ। তাছাড়া কাছে এগিয়েই বা কি করতে পারে ও। ওষুধ-পথ্য কোনটাই পাওয়ার উপায় নেই এখানে। নিজেরই এক পেট খাওয়া যোগাড় করতে এতক্ষণ যা করতে হল, তাতে মেয়েটাকে ও কি সাহায্য করতে পারে! এ ঘটনা যদি ওদের গ্রামের দিকে ঘটত, শিবু যেভাবেই হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করতে পারত। কিন্তু এ যে বিদেশ।

ফলে, চোরের মতো ধীরে ধীরে পালিয়ে এল শিবু। এখন নিজের প্রাণ নিজে বাঁচানো ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই।

দশ

ঘাটেব কাছাকাছি এসে শিবু দেখল, কাতারে-কাতারে লোক ওপারে যাওয়ার জন্যে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। আট দশটা নৌকা এপাশ-ওপাশ ছড়ান। তাতে আগভাগেই লোক উঠে বোঝাই হয়ে আছে। মাঝিও দাঁও বুঝে দর হাঁকতে শুরু করেছে, জনপ্রতি পাঁচ টাকা।

—বলে কি! খেয়া পারাপার হতে পাঁচ টাকা! এমনি দিনে ছ-আনা যার ভাড়া, আজ তা পাঁচ টাকা। আর ঐ পাঁচ টাকায় পারাপার হবার জন্যে অত লোক! তাহলে আর দশ টাকা দিয়ে বাসি ভাত খেয়ে কি এমন অন্যায় করেছে শিবু!

হল কী চারপাশে! আইন-কানুন সব উঠে গেল নাকি! কেউ কোন প্রতিবাদও করছে না। পাঁচ টাকা, পাঁচ টাকাই সই। এখন যেন টাকা-পয়সা সব খোলামকুচি।

ভেবে দেখল, টাকার মায়া করলে ওরও আর ওপারে যাওয়া হবে না। এখন আর প্রতিবাদের সময় নয়, এখন কেবল মুখবুজে সয়ে যাওয়া। ফলে, যেভাবেই হোক, নৌকোতে ওর উঠে পড়াই উচিত। কিন্তু কোথায় উঠবে ও! পার থেকে দশ পনের হাত নিচে নদী, হাঁটু-ডুবে-যাওয়া কাদা ডিঙোতে হবে। কাদায়ও আপত্তি নেই, কিন্তু নৌকোর দিকে এগোতেই হা-হা করে তেড়ে এল কয়েকজন, এখানে নয়, এখানে নয়। শিবুকে কে যেন ধাক্কাই মেরে বসল। লাঠিটা ছিল বলে কোনরকমে সামলে নিল শিবু।

অন্যসময় হলে শিবু লোকটার মাথায় লাঠির ঘা বসিয়ে দিত, কিন্তু এখন আর ঝামেলায় গেল না। লোকটার দিকে অদ্ভুতচোখে তাকিয়ে থাকল।

—দেখছ না, যা লোক ধরে তার চেয়ে বেশি উঠেছে। কানা নাকি? লোকটা শিবুকে ধাক্কা মেরে যে অন্যায় করেছে, তা শুধরে নিতেই যেন বিড়বিড় করে বলল।

শিবু কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। উত্তর দিয়ে কোন লাভও নেই।

—ওপার থেকে এখনি আরো নৌকো আসবে, তাতে উঠো। আর একজন কে উপদেশ দিল শিবুকে। শিবু নিরুপায়, হতাশ চোখে তাকিয়ে রইল নৌকোটার দিকে। ওপার থেকে যে নৌকো আসবে তাতেই যে ওঠা যাবে এমন ভরসা নেই। তবু ভালো, এখনো প্রচুর বেলা রয়ে গেছে। ওপারে পৌঁছে ঘণ্টা তিনেকও যদি হাতে পাওয়া যায়, তাহলে আজই মন্দিরতলায় পৌঁছে যেতে পারে ও। আর কাল সকালের মধ্যেই তাহলে পুষ্পর কাছে।

লোক বোঝাই নৌকো দুটো ছেড়ে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল শিবু। আড়াক্ষিয়ার জল এখন অসম্ভব ঘোলা, গেরুয়া। প্রচণ্ড টান রয়েছে জলে। হয়তো এই টানের মধ্যে নজর রাখলে দুটো চারটে মড়াও চোখে পড়া অসম্ভব নয়।

সমুদ্রের মতো ছড়ান নদী। ওপারে তাকাল শিবু। কচুবেড়েকে জল থেকে আলাদা করে চেনার উপায় নেই। কচুবেড়ে কী এখনো জলের তলায়! তাহলে কী আশায় সবাই ছুটে যাচ্ছে ওদিকে।

কাদার মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে শিবু। অবশেষে পরপর আবার দুটো নৌকো আসতে দেখা গেল। নৌকোদুটো টলতে-টলতে আসছে। দুটো-চারটে মাত্র লোক দেখা যাচ্ছে নৌকোয়। ওপার থেকে আসার লোক নেই। এখন কেবল যাওয়া। ছেড়ে-আসা জায়গা জমি বাড়িঘরের আবার দখল নেওয়া।

শিবু নৌকোদুটোর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। ও-দুটোর যে-কোন একটাতে লাফিয়ে উঠতে হবে তাকে। চারপাশে ছড়ান-ছিটান যত লোক সবাই যদি ওপারের যাত্রী হয়ে থাকে, তাহলে ও

ছুটো নৌকোর পক্ষেও যথেষ্ট নয়। ওরকম আরো আট-দশটা নৌকো দরকার।

ফলে, শিবু আরো একটু জলের ধারে এগিয়ে থাকল। লাঠিটার ওপর ভর রাখল দেহের।

দেখল, নদীর ধারে হাঁটু-জলে দাঁড়িয়ে আছে এক দঙ্গল মেয়ে। সঙ্গে লটবহর বাক্স-বস্তা। ওদের ডিঙিয়ে যাবার উপায় নেই। মেয়েদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করার ক্ষমতা অনেক মদ্দ যোয়ানেরই থাকে না, শিবু তো কোন ছাড়!

নৌকোছুটো পারের কাছাকাছি এসে পড়তেই উত্তেজনা বাড়ে চারপাশে। শিবু বুঝল, রীতিমতো লড়াই করে উঠতে হবে। চাই কি ছু-চার জনকে যদি ধাক্কা দিয়ে ফেলেও দিতে হয় তাহলেও ভাবলে চলবে না। স্বার্থপর না হলেই ঠকতে হবে।

শিবু আরো এগোল। নৌকোছুটো পারে এসে লাগবার আগেই কসরৎ করে লাফিয়ে উঠে পড়ল। হাঁটুতে প্রচণ্ড জোরে একটা ঘা খেল শিবু। ঝন-ঝন করে উঠল সারা গায়ে। কিন্তু তখন আর সে-সব ভাববার সময় নেই।

ঝড়ের বেগে আরো লোক উঠছে নৌকোয়। মাঝিদের গালি-গালাজ কানেই নিচ্ছে না কেউ। টালমাটাল নৌকোটা নিমেষেই বোঝাই হয়ে গেল।

এরকমই হওয়ার কথা। যে-পরিমাণ যাত্রী তার তুলনায় এ ছুটো নৌকোয় আর কত ধরে! কিন্তু আরো উঠছে যে! লোক ওঠা এবার থামানো দরকার। মাঝিরা বাঁশ তুলে তেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু কে কার কথা শোনে! কে কাকে আটকায়!

শিবু প্রমাদ গুনল, যেভাবে লাফালাফি শুরু হয়েছে, শেষপর্যন্ত ডুবে যাবে না তো!

—ও মশাই, উঠবেন না, উঠবেন না। এখনি আরো নৌকো আসবে, তাতে উঠুন।

ঘাটে এসে শিবুকেও প্রথমে এরকম উপদেশ শুনতে হয়েছিল। কিন্তু এখন ও নিজেই উপদেশদাতা। শিবুর ভারী মজা লাগল কথাটা ভাবতে।

অনেকক্ষণ ধরে ঐ রকম ধস্তাধস্তি চলল। ক্রমশ সবাই স্থির হয়ে এলে নৌকোটা একপাশে একটু কাত হয়ে পড়ল। মাঝিরা একপাশের ভিড় সরিয়ে আর একপাশে ঠেলে দিয়ে নৌকো সোজা করল। এবার দুর্গা-দুর্গা করে যাত্রা শুরু করতে যেটুকু সময়।

ঠাসাঠাসি ভিড়ের মধ্যে কোনরকমে পা গুটিয়ে বসে থাকে শিবু। চোখে পড়ে পাতলা একটা রোদ ছড়িয়ে পড়েছে চরাচর জুড়ে। আকাশে এখনো পাতলা মেঘ রয়েছে, কিন্তু সেই মেঘের ভেতর দিয়েই হালকা একটু রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। বাতাসে এখনো অল্প-অল্প টান।

আরো কিছুক্ষণ পর নৌকোটাকে কচুবেড়ের উদ্দেশে ছেড়ে দিল মাঝিরা। কাকদ্বীপের রহস্যময় ভিড়ের কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে শুরু করল ওরা। শিবুর চোখ জলের দিকে। অসম্ভব ঘোলা জল নৌকোর গা-ছুঁয়ে ছুটে যাচ্ছে। জলের ঢেউগুলিকে এক একটা তেজি সাপের মতো পাক খেতে দেখা যাচ্ছে। সন্দেহ নেই জলের ভাঁজে-ভাঁজে সাংঘাতিক সব কামট রয়েছে। কামটগুলি কি গোপনে নৌকোর সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছে! অসম্ভব নয়। নৌকোটা ডুবে গেলে এতগুলি তাজা মানুষ পাবে ওরা। এ-লোভ সামলে রাখা কম নয়।

নৌকোটা ডুবে গেলে বলার কিছু নেই। যা লোক ধরার কথা, তার চেয়ে অনেক বেশি চেপে বসেছে। শিবুর মনে হল, নৌকোটা যেন আবার একপাশে কাত হয়ে পড়েছে। কিন্তু কারো যেন কোন দুশ্চিন্তা নেই এ নিয়ে। এ অবস্থায় মাঝিরা একটু বেসামাল হলেই আর রক্ষে নেই! সারাক্ষণ প্রাণ মুঠোয় করে বসে থাকা ছাড়া আর উপায় নেই এখন।

নৌকোটা দেখতে দেখতে এখন মাঝ নদীতে চলে এল। চারদিকে

কেবল জল আর জল। কাকদ্বীপটাকে এখন আর চেনার উপায় নেই। ওপারে কচুবেড়েকেও চেনা যাচ্ছে না। নৌকোটা ঠিক মতো এগোচ্ছে কিনা কে জানে! মাঝিরাই শুধু ভরসা বলে মনে হল শিবুর।

জলের ভাঁজে ছুটে যাওয়া সাপের মতো ঢেউগুলির দিকে তাকিয়ে থাকে শিবু। আর ঐ ভাবে বসে থাকতে-থাকতে হঠাৎ মনে হল, ওরা যেন নোয়ার নৌকোয় চেপে চলেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এখন জলের তলায়।

নৌকোর একটা গলুইয়ের কাছাকাছি বসেছিল শিবু। গায়ে-গায়ে ঠাসাঠাসি হওয়া আরো কয়েকজন। পাদুটো এমনভাবে ভাঁজ করে রাখতে হয়েছে যে চিনচিন করছে এখন। পাদুটো একটু সরিয়ে সামনের দিকে ছড়িয়ে দিতে পারলে কিছুটা সুবিধা হতো। কিন্তু অসম্ভব। সামনের দিকেই একটা বুড়িমতো বসে প্রথম থেকেই কেবল ধুঁকছে। মাঝে মাঝে অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ করে উঠছে। বুড়িটার গায়ের ওপর পা তুলে দেওয়া যায় না। বরং হাজার কষ্ট হলেও এখন ওভাবেই ওকে থাকতে হবে।

শিবু আবার চারপাশে তাকায়। আদিগন্ত অফুরন্ত জলের দিকে তাকিয়ে পায়ের কনকনে ব্যথাটা ভুলে থাকার চেষ্টা করে। আর ঠিক এই সময় নৌকোটা হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেয়ে দুলে ওঠে। শিবু চমকে উঠেছিল। দেখল, ওপাশে গলুইয়ের কাছাকাছি হঠাৎ দু জনের হাতাহাতি শুরু হয়ে গেছে।

—কি ব্যাপার। কি হল আবার।

লোকদুটো উঠে দাঁড়িয়েছে। শিবু দেখল, দুটো কুকুর ঝগড়া করার আগে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেমন গরগর করে ফোঁসে, অনেকটা সেই ভঙ্গি নিয়েছে লোকদুটো।

নৌকোয় প্রায় সবাই চেঁচিয়ে উঠেছে, হচ্ছে কি, অ্যাঁ, কি হচ্ছে?

মাঝিরা ঝগড়া থামাবার জন্যে দুপাশ থেকে দুজনকে টেনে ধরল। নৌকোটা এপাশ-ওপাশ দুবার প্রচণ্ডভাবে দুলে উঠল।

শিবুও চেঁচিয়ে উঠল, ডুবিয়ে মারবে নাকি। হল কি ওদের? ও মাঝি?

লোকদুটো অবশ্য বকতে-বকতে সরে গেল। কিন্তু সরে বসেও রাগে গজরাতে লাগল।

—হল কি ওদের! এই দুঃসময়ে কেউ ঝগড়া করে নিজেদের মধ্যে, আশ্চর্য!

মাঝি যেন মওকা পেয়েছে, বলল, তখনই বলেছিলাম, উঠবেন না। এতলোক ধরবে না এ নৌকোয়। কেন, পরের নৌকোয় এলে হতো না!

বসার জায়গা নিয়েই বিবাদ। শিবুর মতো হয়তো লোকদুটোরও হাঁটু টনটন করে ফেটে পড়ছে। একজন হয়তো যন্ত্রণা সইতে না পেরে আর একজনের ঘাড়ে পা ছড়িয়ে দিয়েছিল। কিংবা—

শিবু দেখল, লোকদুটো এবার ঠাণ্ডা হয়েছে। আর কতক্ষণ পর কচুবেড়ে! চারপাশে কেবল জল আর জল। কচুবেড়ের দিকেই যাচ্ছি তো! কে জানে মাঝিরা এই অথৈ জলের ভেতর দিয়ে কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে ওদের। যা থাকে কপালে, দু হাঁটুর মধ্যে হাত চেপে বসে থাকে শিবু।

এপার থেকে ওপার হতে ঘণ্টাদেড়েক লেগে গেল ওদের। শিবু আকাশের চেহারা দেখে বুঝল, দুপুর গড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ। এখনো যা সময় আছে, হয়তো মন্দিরতলা অবধি পৌঁছে যাওয়া যাবে। রাতটা সেখানে কোনরকমে কাটিয়ে কাল সকালেই চন্দনতলা। কাল সকালেই হয়তো পুষ্পদের দেখতে পাবে শিবু। ভাল আছে তো পুষ্পরা!

নৌকোতে উঠবার সময় যেমন হুড়োহুড়ি লেগেছিল, নামবার সময়ও সেরকম। মানুষগুলি কেমন খ্যাপা কুকুরের মতো হয়ে গেছে। ধৈর্য বলে কারুরই কিছু নেই যেন। সেই ঝগড়া-করা লোকদুটোও মুখবুজে নেমে এল।

নেমে এল শিবুও। এখানেও একহাঁটু কাদা। লাঠিতে ভর রেখে বাউণ্ডারির ওপর উঠে এল ও। উঠে চারপাশে তাকাল। হায় কপাল, এ কোন কচুবেড়ে! এ যে কিছুই চেনার উপায় নেই। গ্রামের বাড়িঘর সব গেল কোথায়! এদিক-ওদিক গাছ উলটে পড়ে আছে। কারোবা বাড়ির বেড়া ভাসিয়ে এনে বাউণ্ডারির গায়ে ফেলেছে। একেবারে লণ্ডভণ্ড চেহারা।

বন্যায় আর ঝড়ে যে এমন কাণ্ড হতে পারে এ-দৃশ্য চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করা যেত না। ভেড়ির ওপর থেকে অনেক দূর অবধি চোখ যায়। কোথাও কোথাও এখনো ডোবা পুকুরের মতো জল দাঁড়িয়ে আছে। কাদার যেন কোন সীমা-পরিসীমা নেই। গ্রামের দিকে এগোতে হলে ঐ কাদা ভাঙা ছাড়া উপায় নেই। শিবু দেখল, নৌকো থেকে যারা নামল, তারা সকলেই কাদায় নেমে এগোতে শুরু করেছে।

কিন্তু বাউণ্ডারি ধরে এগিয়ে গেলেই শিবুর সুবিধা। এই বাউণ্ডারি ধরে এগোতে-এগোতে এক সময় মন্দিরতলাকে পাওয়া যাবে। মন্দিরতলায় আবার একবার খেয়াপারের ঝামেলা আছে। সেই খেয়াটা পার হলেই চন্দনতলার অনেক কাছাকাছি পৌঁছে যাবে শিবু।

ভেড়ির ওপর দাঁড়িয়ে শিবুর মনে হল, বাড়ির অনেক কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ও। এখন পুষ্পদের ভালো দেখতে পেলেই বাঁচা যায়।

বাউণ্ডারির গায় শ-খানেক হাত দূরে বেশ কিছু লোকের জটলা চোখে পড়ল শিবুর। বোঝা যায়, কোনক্রমে ডালপাতা ভেঙে ঝুপড়ি বানিয়ে তাতে মাথা গুঁজেছে লোকগুলি। কেমন হতচ্ছাড়া দেখাচ্ছে সবাইকে। তাকাতে ভয় হয়। লোকগুলি যেন হা-হা করে ছুটে এসে এখনি শিবুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। শিবু চোখ ফিরিয়ে নিল। আর ঠিক এ সময়ই লক্ষ্য করল, বুভুক্ষু কিছু হাত এগিয়ে আসছে ওকে লক্ষ্য করে। ঝুপড়ি ঘর থেকে পিলপিল করে লোকগুলি ঘাটের দিকেই এগিয়ে আসছে।

শিবু থমকে দাঁড়াল। লোকগুলো এগিয়ে এলে ঝামেলা হবে। ওরা ক্ষিধের জ্বালায় শিবুকেও চিবিয়ে খেতে পারে। ফলে, অসহায়-ভাবে শিবু এমন ভঙ্গি করল যেন ওদেরই মতো বন্যায় ক্লিষ্ট শিবুও ওদেরই মতো না-খেয়ে আছে।

কিন্তু কয়েকটা কচি মুখ শিবুকে কিছুতেই ছাড়ে না। গায়-গায় সেঁটে রইল। শিবু হাত-পা ঝেড়ে দেখাল কিছুই নেই, কিছু থাকলে তো ও দেবে!

তবু আরো কিছুক্ষণ ঘ্যানঘ্যান করল বাচ্চাগুলি। অবশেষে আরো একটা খেয়া আসতে দেখে ছুটে গেল সেদিকে।

শিবু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। পৃথিবীতে সবচেয়ে সাংঘাতিক এই না-খেয়ে-থাকা মানুষ। ওরা না পাবে হেন কাজ নেই। ধরা যাক, শিবুও যদি না-খেয়ে চলে আসত কাকদ্বীপ থেকে, তাহলে কি শিবুও ওদের মতো খেয়া নৌকোগুলিব দিকে ছুটোছুটি করে এগিয়ে গিয়ে হাত পাতত! হাত-পাতা ছাড়া উপায় কী। তবু যদি কেউ কিছু দয়া দেখিয়ে দেয়। টাকা-পয়সা নয়, সোনা-গয়না নয়, শুধু একমুঠো ভাত। ভাত এখন সোনার চেয়েও দামী। ভাত নিয়ে এরই মধ্যে নানান গল্প-কাহিনী শুরু হয়ে গেছে বোধহয়। কয়েক মুঠো টাকার বিনিময়ে একমুঠো ভাত যদি পাওয়া যায় তাহলে আর পায় কে। হবে না, ঘরে ঘরে যার যেটুকু ধান ছিল, চাল, ডাল, তেল, নুন ছিল সব ভাসিয়ে নিয়ে গেলে এরকমই হয়।

কঙ্কালসার লোকগুলি খেয়া নৌকোটাকে ছেঁকে ধরেছে। লোক-গুলির দিকে তাকিয়ে থাকে শিবু। এখনো যে ওরা হিংস্র হয়ে উঠছে না এই তো ঢের! কতদিন ওরা ঐ রকম ধৈর্যের পরীক্ষা দেবে কে জানে! তবু ভালো, এ-জায়গা থেকে এখনি চলে যাবে শিবু। এরকম দৃশ্য আর বেশিক্ষণ ওর দেখার প্রয়োজন হবে না।

আঁকাবাঁকা বাউণ্ডারিটার দিকে তাকাল শিবু। যতদূর চোখ যায় একটাও লোক নেই। তবে কি বাউণ্ডারি ধরে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

ঘুর-পথে গ্রামের ভেতর দিয়েই এগোনো উচিত কি ওর! সবাই তো ওদিক দিয়েই এগোচ্ছে। শিবু গ্রামের ভেতর দিয়ে এগোবার জন্যে আবার ফিরে আসতে শুরু করল।

এমন সময় হঠাৎ ভয়ে চমকে উঠল শিবু। কে যেন পেছন থেকে ওকে ডেকে উঠেছে, বাবু।

—ভয় পেয়ে গেলেন? লোকটার চোখে বিস্ময়। আমি ভেবেছিলাম মানুষজন সবাই ভয় ভুলে গেছে।

—না, মানে, শিবু সম্বিত ফিরে পেয়ে তাকাল, দেখল, গ্রামের এক বুড়ো মুসলমান। বয়স আশি নব্বইয়ের কম নয়, চোখদুটো কোটরে ঢুকে আছে। কোমরে জড়ানো সামান্য একটা ছেঁড়া কানি। বুকের হাড়-পাঁজরাগুলি দেহ ভেদ করে চাড় দিয়ে অসম্ভব ফুলে উঠেছে। কণ্ঠা জেগে ওঠায় গলার দুপাশে বিরাট দুটো গর্ত।

লোকটাকে অসম্ভব লম্বা মনে হল ওর। কি চাই? অমন করে হঠাৎ পিছু ডাকলে ভয় পাব না?

—কোথায় যাবেন গো বাবু, একবার ওদিকে গেলেন একবার এদিকে এলেন। মনে সন্দ হল, তাই ডাকলাম।

শিবু লোকটার কাছাকাছি এগিয়ে এল, মন্দিরতলার দিকে যাবার ইচ্ছে। একটু এগিয়ে গ্রামের ভেতর দিয়ে গেলেই তো সোজা হবে? তাই না?

বুড়োটা হাসল, চোখদুটো যেন জ্বলছে, মরতে হয় তো গ্রামের দিকে যান বাবু।

—মানে! লোকটা কি হেঁয়ালি করছে!

—না গো বাবু, হেঁয়ালি করব কেন, ঐ গ্রামের দিক থেকে সকালে আমরা এয়েচি। ওদিকে এখনো রাস্তাঘাট সব জলের তলায় ডুবে আছে। সেই জলে জোয়ারভাঁটাও খেলছে গো বাবু!

—তাহলে?

—এখনো ওদিকে গাছের ডালে-ডালে মানুষ ঝুলছে। গাছ থেকে যে নামবে তার উপায় নেই।

শিবু হাঁ করে বুড়োটার কথা গিলল। অবিশ্বাসইবা করে কি করে!

—তাছাড়া কি জানেন বাবু, ঐ গ্রামের দিকে মানুষের এখন মতিগতিরও ঠিক নেই। একে সব না-খাওয়া, তায় মরার ভয় কেটে গেলে যা হয়। পথে কখন কার মুখে পড়ে যাবেন, সেটা কি ভাল হবে।

—তাহলে কিভাবে যাই বলো দেখি? করুণ-গলায় জিজ্ঞেস করল শিবু। মন্দিরতলা আমাকে না গেলেই নয়। মন্দিরতলার কোন খবর জানা আছে?

—বুড়োটা বলল, একটা কাজ করুন বাবু, বাউণ্ডারি ধরেই এগিয়ে যান। একটু ঘুর-পথ হলেও ওদিকেই ভয় কম। বাউণ্ডারির ধারে ধারে অবশ্য দু-মাইলের মধ্যে সব বাড়িঘর ধুয়ে-মুছে গেছে, প্রচুর মড়া পড়ে আছে বাউণ্ডারির ধারে ধারে, তবু ওদিক দিয়েই যাওয়া ভাল। মড়া তো আর উঠে এসে মাথায় ডাণ্ডা মারতে পারবে না, জ্যান্ত লোকদেরই এখন ভয় বেশি।

লোকটা যে শিবুকে বিপদে ফেলার জন্যে উপদেশ দিচ্ছে, তা মনে হল না। কি লাভ ওর শিবুকে বিপদে ফেলে! কিন্তু এ সময় ওর মনে পড়ল, কয়েকটা খাল পড়বে বাউণ্ডারির রাস্তায় এগোলে। খালগুলি কি করে পার হবে শিবু!

লোকটা বলল, খালগুলি সব মরে মজে আছে বাবু। এত পলি পড়েছে খালে যে এক কোমর জল ডিঙোলেই চলে যাওয়া যাবে। আমি বলছি বাবু এদিক দিয়ে যান, জল কম পাবেন। আর গ্রামের ভিতর দিয়ে যদি যান বাড়ি অবধি পৌঁছবেন কিনা কে জানে।

শিবু আবার বাউণ্ডারির ওপর যতদূর চোখ যায় দেখে নিল। রোদ চিকচিক করছে চারপাশে। বেলা মোটামুটি এখন পড়ন্ত। তা হোক,

আর সময় নষ্ট না করে এখনি ওর এগিয়ে যাওয়া দরকার। শিবু বলল, ঠিক আছে, আপনার কথা মতোই এগোচ্ছি তাহলে। একটা টাকা ব্যার করে লোকটার হাতে গুঁজে দেয় শিবু।

—টাকায় কি করব গো বাবু! টাকা তো এখন কাগজ।

—তা অবশ্য ঠিক। খাবার-দাবার কিছুই নেই। বলল, কাকদ্বীপে কিছু কিনব ভেবেছিলাম, কিন্তু দোকানপাট সব লুট হয়ে গেছে।

লোকটা বলল, লুটের নাম করে ওরাই সরাচ্ছে।

—সরিয়ে নিয়ে লাভ?

—লাভ নেই, কি বলেন! এক একটা চাল ভাত করে এক এক পয়সায় বিকোবে। কত পয়সা!

শিবুও এ-অঙ্ক জানে। এটাই এদেশের নিয়ম। এ-নিয়ম পালটাবে সাধ্য কার! বলল, যে যাই করুক, পাপপুণ্য বলে তো একটা কথা আছে। পাপ করলে তার শাস্তি হবেই।

বুড়ো হাসে, না কাঁদে বোঝা গেল না। বলল, তবে বাবু ওসব হিসেব না বোঝাই ভাল। মানুষ তো আর মানুষের মাংস খেতে পারে না, এই যা ভরসা। খেতে পারলে দেখত, ক্ষিধে মেটাবার এমন সহজ পথ আর কিছুই নেই।

লোকটা স্বাভাবিকভাবে কথা বলছে কিনা সন্দেহ হয় শিবুর। আর ওর মুখোমুখি দাঁড়াতে সাহস হয় না। বলল, আমি তাহলে ভেড়ি ধরেই এগোই, ঐ পথই সোজা হবে তো?

লোকটা বলল, এগোন। এগিয়ে তো যান। আল্লা ভরসা।

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল বুড়োটা, শিবু তা শোনবার চেষ্টা না করেই এগোতে লাগল। খানিকটা পালিয়ে আসার ভঙ্গিতেই শিবু যাত্রা শুরু করে দিল।

এগার

কিন্তু বাউণ্ডারির ওপর দিয়ে চলা দায়। ভেড়ির ওপরে এখনো চটচটে কাদা। পা হড়কাবার ভয়। নিচে নদীর ঢালের দিকে কাদার মাত্রা যেন আরো বেশি। তবু ঐ নদীর ঢাল ধরেই এগোতে শুরু করল শিবু। আকাশের মেঘ কেটে গিয়ে এখন একটা নীলচে আভা ফুটে বেরিয়েছে। কে বলবে, এই আকাশটা গতকাল রাতে অঝোরে বৃষ্টি ঝরিয়েছে।

শিবু নদীর দিকে তাকাল, ধু ধু করছে নদী। ওপারের কিছুই প্রায় চোখে পড়ে না। কাকদ্বীপও এখন দৃষ্টির বাইরে। অফুরন্ত বিস্তীর্ণ জলের দিকে তাকালে মনে হয়, যেন সমুদ্র দেখছে শিবু। ছোট ছোট অসংখ্য ঢেউ তুলে জলরাশি হু হু করে ছুটে চলেছে। আর তাতে ভেসে চলেছে নানান ধরনের আবর্জনা। শিবু দেখল, বড় বড় গাছের গুঁড়ি ভেসে যাচ্ছে। সেই গাছের গুঁড়ির ওপর বসে জলের ঢেউয়ে দোল খেতে খেতে ভেসে চলেছে শকুন।

রশি দশ-বারো এগোতেই শিবু চমকে উঠল, নদীর গায়-গায় উঁচু হয়ে একটা মড়া পড়ে আছে। ফুলে উঠেছে। কবেকার মড়া কে জানে। বিকৃতি ঘটেছে। হয়তো নদী দিয়ে ভাসতে ভাসতে চলেছিল, হঠাৎ পারে এসে আটকে গেছে। কেমন যেন সারা গায়ে শিরশির করে ঝাঁকি দিয়ে ওঠে ওর। বেচারা কোন গ্রামের মানুষ, কে জানে। কোন সংসারের সর্বনাশ ঘটিয়ে লোকটা এখানে এসে মুখ থুবড়ে পড়ল। ওর আত্মীয়স্বজনরা হয়তো কোনদিন আর হদিশই পাবে না ওর।

মড়াটার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না শিবু। ওর মুখটা এমনভাবে বাঁকা হয়ে কাদার মধ্যে বসে গেছে যে বোঝা যাচ্ছে

না এই মৃত্যুর জন্যে শেষমুহূর্তে ও ভগবানকে অভিশাপ দিয়েছিল কি না। আর একটু নেমে আরো জলের দিকে এগিয়ে গেলে মুখের খানিকটা হয়তো দেখতে পেত শিবু, কিন্তু সাহসে কুলোল না। মৃতদেহ দেখে ভয় পায় না, এমন লোক পৃথিবীতে কে আছে। অথচ সেই বুড়ো মুসলমানটা ভারী অদ্ভুত কথা বলেছিল, মড়াকে নাকি ভয় পাওয়ার কারণ নেই। মড়া কখনো উঠে এসে মাথায় ডাণ্ডা বসিয়ে দিতে পারে না। হয়তো পারে না, কিন্তু মানুষের আত্মার কথা অবিশ্বাস করে না শিবু। মানুষ মরে গেলে যে ভূত হয় তার কিছু কিছু প্রমাণ শিবুর জানা আছে। সে সব কাহিনী পুরোটাই যে মিথ্যে এমন কথা জোর গলায় এখন আর বলতে পারে না ও।

মড়াটাকে এড়িয়ে আবার ও এগোতে শুরু করে। পেছন দিকে তাকায়। পেছনে বহু দূরে সেই ঘাটটা দেখা যাচ্ছে। লোকগুলিকে এখনো পোকার মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে। ওখানকার কঙ্কালসার লোকগুলিও জীবন্ত কিনা এ সময় সন্দেহ হল শিবুর। এতক্ষণ কী ও এক দঙ্গল মৃত মানুষের সঙ্গে কথা বলে এল, কে জানে।

সেই বুড়োটাকে আর একবার চোখে পড়ে কিনা দেখবার চেষ্টা করল শিবু। কিন্তু না, কঙ্কালের ভিড়ের মধ্যে যেন সেই লোকটাও মিশে গেছে। বাঁচা গেছে।

আরো একটু এগোতেই পাশাপাশি দুটো মড়া গরু দেখতে পেয়ে আবার চমকে ওঠে শিবু। কিম্ভুত চেহারা হয়ে আছে গরুদুটোর। চোখ ফিরিয়ে নিল। পথে এগোতে এগোতে আরো কত মড়া চোখে পড়বে কে জানে। সূর্যের তেজ ক্রমশই কমে আসছে। সঙ্গে টর্চ নেই, রাত্রি হওয়ার আগেই একটা লোকালয় খুঁজে না পেলে আর রক্ষা নেই। গরুগুলিকে দেখার জন্যে সময় নষ্ট করল না শিবু।

আরো এগোতে এগোতে মনে হল, এই বিশ্ব-চরাচরে একমাত্র ও ছাড়া আর কেউ নেই। গা ছমছম করতে থাকে ওর। নদী থেকে বাউণ্ডারি বেশ আট-দশ রশি ভেতরে ঢুকে গেছে। আর চারপাশের

বাতাস এখন মড়ার গন্ধে ভারি। এপাশে-ওপাশে আরো গোটাকয়েক মড়া চোখে পড়ল ওর। আর একটু হলে একটার ওপর পা পড়ে যেত। পা দিতে দিতে লাফিয়ে মড়াটাকে ডিঙিয়ে এল শিবু।

কিন্তু এই বিটকেল গন্ধ সহ্য করা অসম্ভব। পেট ঘুলিয়ে উঠতে থাকে ওর। সঙ্গে গামছা থাকলে নাকে-মুখে জড়িয়ে নিতে পারত। বুড়োটার উপদেশ মতো এদিকে এসে কী ভুল করল শিবু। কিন্তু এখন আর ফিরে যাওয়ারও উপায় নেই।

চারপাশে এত মড়া, অথচ এখন যেন চোখে সয়ে এসেছে শিবুর। প্রথম মড়াটা দেখাব সময় যেমন আঁতকে উঠেছিল এখন আর সে রকম হচ্ছে না। যেন এটাই স্বাভাবিক দৃশ্য দেখছে ও। সতর্ক চোখ ফেলে ফেলে এগোতে থাকে শিবু। কেবল গন্ধটার জন্যেই যা অস্বস্তি।

নাহ্, আর পারা যায় না। ধুতির খানিকটা টেনে তুলে এবার নাকে-মুখে জড়িয়ে নিতে বাধ্য হয় শিবু। কিন্তু যেদিকেই চোখ যায়, কেবল মড়া আর মড়া। মৃতদেহের ভাগাড় হয়ে আছে যেন জায়গাটা।

শিবু ভেবে দেখল, বাঁধের নিচ দিয়ে এভাবে হাঁটার চেয়ে কষ্ট হলেও বাঁধের ওপর দিয়েই হাঁটা উচিত। নরম বাঁধের মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এল আবার। কাপড় দিয়ে নাক ঢেকে নিলেও রেহাই পাওয়ার উপায় নেই। বারকয়েক থুতু ফেলে ভেতরে ঢুকে যাওয়া গন্ধটাকে তাড়াবার চেষ্টা করল। দাঁতে দাঁত চেপে রইল কিছুক্ষণ।

বাউণ্ডারির অপর পাবে বেশ কিছু বড় বড় গাছ দেখতে পেল শিবু। গাছগুলি কেমন ভেঙেচুরে একাকার হয়ে আছে। ডালে-পাতায় খড়ের গুছি আবর্জনা যেভাবে জমে আছে, তাতে সন্দেহ নেই, গাছগুলি জলের নিচে তলিয়ে গিয়েছিল।

শিবু বিস্মিতভাবে গাছগুলোকে লক্ষ্য করল, অতদূর জল ওঠার কথা ভাবাই যায় না। গাছের ডালে-পাতায় যারা আশ্রয়

নিয়েছিল তাদের অবস্থাটাও এবার চোখের ওপর ভেসে উঠল ওর।

আবার এগোতে শুরু করে শিবু। আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটা নেই এখন। সূর্যটা রক্তিম হয়ে নদীর শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ডুবে যাবে। তারপর সমস্ত চরাচরই অন্ধকারে ডুবতে শুরু করবে। অথচ এখনো ধারে-কাছে গ্রামের চিহ্ন নেই। একটা মানুষের মুখও দেখা যাচ্ছে না। যেন মহাশ্মশানের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে শিবু। কে জানে, এ শ্মশানের শেষ কোথায়।

সূর্যের লাল আলোয় সমস্ত নদীজুড়ে এখন টকটকে আলতার স্রোত ছুটে চলেছে।

চোখ ফিরিয়ে আনতেই আবার চমকে উঠল শিবু। মাত্র হাত পাঁচেক নিচে বাঁধের গায়ে একটা যুবতীর মৃতদেহ। ভেড়ির মাটি খামচে মুঠোয় ধরে রেখেছে যুবতী। হয়তো বাঁচার শেষ চেষ্টাটুকু ওর ঐভাবেই বিফলে গেল। অসম্ভব বে-আব্রু হয়ে পড়েছে মহিলাটি। উদ্ধত যৌবন এখনো ফুটে রয়েছে সারা গায়ে। সূর্যের টকটকে আভায় পিঠ-ছাপান চুলের ঢল রঙিন হয়ে উঠেছে। মুখ দেখার উপায় নেই, কাদায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ও। শরীরে কী পচন শুরু হয়েছে। বুঝতে পারল না শিবু। বাতাস বিষাক্ত গন্ধে ভরপুর। মেয়েটার শরীর থেকেও কী গন্ধ উঠে আসছে।

ভাবতে কেমন কষ্ট হয়, এরকম জলজ্যান্ত যুবতীর দেহও পচে যায়। মানুষ তাহলে অত বড়াই করে কিসের। মৃত্যুতেই তো সব শেষ হয়ে যাবে।

শিবু আরো কিছুক্ষণ মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল। মানুষের আজ দুর্দিন, নইলে এরকম একটা দৃশ্য দেখার জন্য হাজারে-হাজারে লোক ছুটে আসত। তোলপাড় হয়ে যেত এই বাঁধের ধারে।

নাহ্, আর দাঁড়ান উচিত নয়। অন্ধকার হয়ে গেলে আর হাঁটাই যাবে না। তাহলে এই পচা-গলা দেহগুলির সঙ্গেই রাত

কাটাতে হবে ওকে। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দেয় শিবু। কিন্তু হাত পঁচিশেক দূরেই আবার কি ওটা। এবারও একটু থমকে দাঁড়াতে হল। একটা বাচ্চাকে কোলে করে একটা মা মরে পড়ে আছে। মা-ই হবে হয়তো। মরে যাওয়াটা যে এত সহজ আগে কে জানত। একটা মৃত্যুকে নিয়েই তো কত ওলট-পালট হয়ে যায় সংসারে, আর এখানে হাজার হাজার মড়া। মৃতদেহের মিছিল। কিন্তু এত মৃত্যুতেও চারপাশ কত শান্ত।

আরো এগিয়ে এসে আর একটা অভাবনীয় দৃশ্য ওর চোখে পড়ল। দেখল, বিরাট একটা গাছের গায়ে নৌকো ঝুলে আছে। নৌকোর একটা গলুই গাছের মাথায় আর একটা গলুই নিচের দিকে অদ্ভুত-ভাবে ঝুলে আছে। খেয়ালখুশি মতো কি না করেছে বন্যা। দৃশ্যটা বড় অদ্ভুত লাগে শিবুর। কিন্তু এখন আর এসব দেখার সময় কোথায়। এখন আরো নিস্তব্ধ হয়ে আসছে চারপাশ। সূর্যটা নদীর জলে ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন ধোঁয়ার মতো হয়ে আসছে দিকবিদিক। হায় সর্বনাশ, অন্ধকারের আগেই ওর বাউণ্ডারিটা পার হয়ে কোন গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়া উচিত ছিল। কিন্তু একটা লোকও দেখা যাচ্ছে না যে জিজ্ঞেস করে নেবে লোকালয় কোথায়? কতদূরে? একরকম প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটতে শুরু করে শিবু।

ভাঙাচোরা বাউণ্ডারি, পা হড়কে নিচে গড়িয়ে পড়ার ভয়। হাতের লাঠিটার ওপর নির্ভর করে এগোন ছাড়া উপায় নেই। বাউণ্ডারির নিচ দিয়ে চললে হয়তো ছুটতে সুবিধে হত, কিন্তু কখন কোন্ মড়ার ওপর পা পড়ে যাবে ভাবতেই আর ঝুঁকিতে গেল না শিবু।

কিন্তু বেশিক্ষণ ওপর দিয়ে হাঁটাও গেল না। বড় বড় সব ফাটল। কখন কোন্ ফাটলে পা ঢুকে বিপদ ঘটবে কে জানে। শিবু হুড়হুড় করে নিচে নেমে পড়ে ছুটতে শুরু করল। ততক্ষণে সত্যি সত্যি অন্ধকার জড়িয়ে ধরেছে চারপাশ। শিবুর উত্তেজনাও চরমে উঠল।

হঠাৎ আবার। শিবু শিউরে উঠল। কার ওপর পা পড়ল এবার। কাদার মতো কি বস্তু। ঝুঁকে দেখতে গিয়ে ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল। ইস, কী দুর্গন্ধ। দেহটা কেমন পচে থসথসে হয়ে আছে। কার দেহ এটা। মানুষ না কোন জন্তু! কিন্তু এখন আর সে-সব পরীক্ষা করার সময় নেই। পালাতে পারলে বাঁচা যায়। শিবু গোঙাতে গোঙাতে ছুটতে শুরু করল।

কাদায় ঘষে ঘষে পা-টাকে রগড়ে নিল। তবু অস্বস্তি যায় না। চারপাশে ঝিমঝিম অন্ধকার। এখন আর সামনে-পেছনে কিছুই ভাল করে দেখার উপায় নেই। পায়ে এখনো সেই গলিত দেহের পচা কষ লেগে রইল কিনা কে জানে! কিলবিল করে সারা গায়ে যেন পোকা বেয়ে উঠছে।

পরমুহূর্তেই আবার চমকে উঠতে হয়, হাত পঁচিশেক দূরে কি যেন একটা নড়ছে। কী হতে পারে এবার। জীবন্ত কেউ একজন যেন বসে আছে ওখানে। খনা গলায় ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে নাকি! শিবু থমকে দাঁড়াল, কে ওখানে?

কান্নাটা থেমে গেল। মূর্তিটাও স্থির হয়ে দাঁড়াল।

—কে? কথা বলছ না কেন?

তবু সাড়া নেই।

শিবু এগোবে কিনা বুঝতে পারল না। এই মহাশ্মশানে ও-রকম একজনকে দেখতে পাওয়া লক্ষণটা ওর মোটেই ভাল লাগল না। কে জানে, কোন অশরীরী আত্মার সঙ্গেই ও কথা বলছে কিনা! ঘোমটা দেওয়া মূর্তিটা সম্পূর্ণই ওর চোখের ভুল কিনা কে জানে! কিন্তু এরকম অবস্থায় পালাবারও পথ নেই। শিবু আবার জিজ্ঞেস করে, কে ওখানে? হাতের লাঠিটা শক্ত করে চেপে ধরে এবার।

হঠাৎ একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল, মূর্তিটা আরো খানিকটা নদীর দিকে নেমে গিয়ে উল্টোমুখো ছুটতে শুরু করল।

কী আশ্চর্য, কেনই বা ওখানে ও একা বসেছিল, কেনই বা আবার

পালাতে শুরু করল। তবে কী শিবুকে দেখে ভয় পেয়েছে! শিবুকেও কেউ ভয় পাবে এটা ভাবতেই কেমন অবাক লাগে ওর। বরং শিবুরই সবকিছুকে দেখে এখন ভয় পাওয়ার কথা। শিবুরই বুকের ভেতর এখন ছমছম করছে।

মূর্তিটা ততক্ষণে দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। কিন্তু যেখানে ও বসেছিল, সেখানে শাদামতো কি একটা বস্তু পড়ে আছে। বস্তুটাকে দেখার লোভ সামলাতে পারল না শিবু। একটু এগিয়ে গেল। কি রে বাবা! কি ওটা!

ঝুঁকে দেখল, কাপড়ের পুঁটলিতে জড়ান একটা দু-তিন মাসের বাচ্চা। ইস্ একেবারে কচি! বেঁচে আছে, না মরে গেছে। একেবারে নড়ছে না। পুঁটলির ভেতর স্থির হয়ে পড়ে আছে। বোধহয় ঐ মহিলাটিই ওর মা। ওকে ফেলে রেখে ঐভাবে পালিয়ে গেল। সন্তানের চেয়েও নিজের জীবন বোধহয় এখন অনেক বড়। মায়া-মমতা ব্যাপারটাই কেমন যেন ফাঁকি। ওসব মানুষের সাজানো ব্যাপার। এখন বন্যা এসে মানুষের লাজ-লজ্জা মায়া-মমতা সবকিছু কেড়ে নিয়ে গেছে। এখন মানুষের মতো হিংস্র স্বার্থপর জীব আর কি আছে পৃথিবীতে!

শিবু আরো একটু ঝুঁকে শিশুটা বেঁচে আছে কিনা বুঝবার চেষ্টা করল। কিন্তু বোঝা গেল না। হাতের আঙুলগুলো কী নড়ে উঠল! সারা গা কেমন ঝাঁকি দিয়ে উঠল শিবুর। শিশুটি যদি বেঁচে থাকে, শিবুই বিপাকে পড়ে যাবে। শিশুটি যদি ককিয়ে ওঠে, সর্বনাশ, শিবু এই শিশুকে নিয়ে কোথায় যাবে! না, ককিয়ে উঠবার আগেই শিবুর পালান উচিত।

ফলে, আবার ছুটতে শুরু করল শিবু। শিশুটি কি ককিয়ে উঠল, না অসম্ভব! ভুল শুনেছি। আমি ভুল শুনেছি। শিবু প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল।

কিন্তু ছুটবে কি! পা-জড়িয়ে ধরছে কাদা। বার-কয়েক হুমড়ি

খেয়ে পড়ল। আবার উঠল, আবার ছুটল। এমন সময় প্রকৃতির কি পরিহাস, শিবু থমকে দাঁড়াল। বিরাট একটা চাঁদ উঠেছে। সমস্ত চরাচর জুড়ে সেই আলো ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু কী বীভৎস এই আলো। কী বীভৎস কোটি কোটি নক্ষত্র উঠেছে আকাশে। এই সব চাঁদ তারা আকাশ নিয়ে মানুষ কবিতা লেখে। গান বাঁধে। ভাবাই যায় না।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে শরীরের ক্লান্তিটা জুড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে শিবু। সমস্ত নদীটা এখন চাঁদের আলোয় লকলক করে জ্বলছে। বাউণ্ডারির ওপর আলো পড়ে একপাশে অজগরের মতো বিশাল একটা ছায়া। শিবু দেখল ওর দেহের ছায়াটাও বিরাট লম্বা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বাউণ্ডারির ওপর। ছায়াটার দিকে তাকাতে ভয় হয়। চোখ ফিরিয়ে শিবু সামনের দিকে তাকায়। বহু দূরে টিমটিম করে একটা আলো জ্বলছে। হ্যাঁ, আলোই দেখতে পেল শিবু। তবে কি লোকা-লয়ের কাছাকাছি এসে গেছি। শিবু উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল।

সারা বুক জুড়ে আবার কেমন সাহস ফিরে এল ওর। আলোর দিকে তাকিয়ে এখনি ওর চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হল। কিন্তু এতদূর থেকে কেউ শুনতে পাবে না। শিবু আবার ছুটতে শুরু করল।

বাউণ্ডারি থেকে নেমে শ তিন-চারেক হাত ভেতরে ফাঁকা মাঠের মধ্যে একটা ঝুপড়িঘর। বোঝা যায়, আগে হয়তো কারো বাড়ি ছিল, বন্যায় ধুয়ে মুছে নিয়ে যাওয়ার পর আবার সেটাকে গোঁজাগুঁজি দিয়ে কোনরকমে দাঁড় করান হয়েছে। ভেতরে আলো জ্বলছে। দরজার ঝাঁপটা বন্ধ।

শিবু দরজার সামনে এসে ডাকল, কে আছেন গো? শুনতে পাচ্ছেন?

কিন্তু কোন সাড়া নেই। মনে হল, ভেতরে যেন কে বা কারা কথা বলছিল, শিবুর গলা পেয়েই কেমন থেমে গেল।

শিবু আবার ডাকল, কে আছেন ভেতরে? দয়া করে একটু

দরজা খুলুন না, আমি চন্দনতলার লোক। কাকদ্বীপ থেকে আসছি।

হঠাৎ এবার আলোটা নিভে গেল। নিভে গেল, না নিভিয়ে দিল। আরো আশ্চর্য হল শিবু। কেমন লোক রে বাবা! বিপদে পড়ে ডাকছি, দরজা খুলে দেখবে তো কে?

শিবু আবার অনুনয় করল, দোহাই আপনাদের, দরজা খুলুন। আমি থাকতে আসিনি, খেতে আসি নি। শুধু আমাকে মন্দিরতলাটা কোন দিকে দেখিয়ে দিন। আমি পথ চিনতে পারছি না। শুনছেন?

হঠাৎ মনে হল, ভেতরে ফিসফিস করে এখনো কথা হচ্ছে। একটা নারীকণ্ঠ কি যেন বলছে কাউকে। দরজার কাছে এগিয়ে কান পাতল শিবু।

—দেখুন না দরজা খুলে। মানুষের গলা পাওয়া যাচ্ছে যে।

—অসম্ভব। মানুষ এখানে আসতেই পারে না। দেখলে না, কোন্ দিক থেকে ও এল। ওদিক থেকে এই রাতে কখনও মানুষ আসতে পারে!

—কিন্তু, মানুষের মতো কথা বলছে যে! মানুষের মতো চেহারা।

—ওটা নকল চেহারা, আসলে ভূ-ভূ-ভূত।

শিবু হাসবে না কাঁদবে। নিরুপায়ভাবে বলল, আমি জলজ্যান্ত মানুষ, বিশ্বাস করুন, রক্তমাংসের মানুষ, পথ ভুল করে এসে পড়েছি।

মহিলাটির গলায় আকুতি ঝরে পড়ছে বুঝতে পারে শিবু। কিন্তু পুরুষ গলাটাই যেন বাধা দিচ্ছে। আগ্রহে ঝাঁপির গায়ে কান পেতে থাকে শিবু। মেয়েটিই বলছে, একবার খুলে দেখুন না।

পুরুষটি নাচার, খবরদার বলছি, দরজা খোলা চলবে না। অসম্ভব। এখানে আশ্রয় পেয়েছি, এবার এটুকুও যাবে।

—আচ্ছা মানুষ তো আপনি! খুলবেন না তাহলে?

শিবু বুঝতে পারে নারীকণ্ঠী দরজা খোলার জন্যে এগিয়ে আসছে। পুরুষটি এখনো ওকে বাধা দেবার চেষ্টা করছে।

শিবু একটু তফাতে সরে দাঁড়াল। দরজাটা হয়তো খুলবে এবার।

হ্যাঁ, কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝাঁপটা একটু ফাঁক হল।

আবছা অন্ধকারে ছায়া-ছায়া দুটি মূর্তি। একটা বুড়ো হাড়গিলে মতো আর একটা অল্প-বয়সী মেয়ে। শিবু নিজের পরিচয় দিল, আমার নাম শিবনাথ মণ্ডল। মেদিনীপুরের চন্দনতলায় বাড়ি। কচুবেড়ে থেকে বাউণ্ডারি ধরে আসছি।

বুড়োটার চোখে তখনো কেমন অবিশ্বাস। মেয়েটার চোখেও সন্দেহ নেই এমন নয়। দরজার চৌকাঠ পেরুতেও যেন সাহস নেই ওদের।

শেষপর্যন্ত বুড়োটাই মুখ খুলল, আরো পেছনে সরে দাঁড়াও বাপু। সারা গা দিয়ে তোমার বিটকেল গন্ধ বেরুচ্ছে। হ্যাঁ, এবার সত্যি করে বলতো তুমি কে?

—এই ছাখো, শিবু হাসবার চেষ্টা করে, মানুষ না হলে এখানে এসে দাঁড়ালাম কি করে! বাউণ্ডারি ধরে আসতে আসতে এত মড়া ডিঙোতে হয়েছে যা বলবার নয়। আমাকে শুধু মন্দিরতলার পথটা বলে দিন, আমি চলে যাই।

মেয়েটি ইতিমধ্যে আবার আলো জ্বালিয়েছে। শিবু দেখল, একটা তেলের কুপি। কুপিটা এগিয়ে এনে দরজার সামনে দাঁড়ায় মেয়েটি। চৌকাঠ পার করে কুপিটাকে মাটিতে রাখে। এবার ঐ কুপির আলোয় মুখদুটোকে ভাল করে দেখতে পেল শিবু। ভয়ে কেমন ফ্যাকাসে হয়ে আছে ওরা। শিবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। বুঝতে পারে না, ওরা কি স্বামী-স্ত্রী, না বাপ-মেয়ে! স্বামী-স্ত্রী যদি হবে, মেয়েটির কপালে সিঁদুর নেই কেন? আর বাপ-মেয়েও হতে পারে না। দু-জনের চেহারায় বিন্দুমাত্র মিল খুঁজে পেল না শিবু। কেমন যেন খটকা লাগে ওর। কিন্তু এখন এইসব নিয়ে কথা হয় না।

বুড়োটা এবার তেলের কুপির দিকে আঙুল তুলে ধরল, কিছু মনে করো না বাপ, দিনকাল তো ভাল নয়, তাই বলছি, একটু আগুনে হাত ছোঁয়াও দেখি?

শিবু কুপিটার দিকে তাকায়। এখনো আমাকে বিশ্বাস করলেন না, ঠিক আছে, দেখুন। কুপির আগুনে হাত রাখে শিবু, সরিয়ে নেয়।

মেয়েটি শুধাল, কোত্থেকে আসছেন?

—বললাম তো কাকদ্বীপের কাছাকাছি গাইগাছি থেকে। খেয়া পেরুতে গিয়েই বিকেল গড়িয়ে গেল। তখন আর না এগিয়েও উপায় ছিল না। দূর থেকে হঠাৎ আলো দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলাম।

লোকটার ত্রাস বুঝি তখনো কাটে নি। বলল, মাইল দুয়েক হাঁটলেই মন্দিরতলার খেয়াঘাট পাওয়া যাবে। সোজা এই রাস্তা ধরে এগোলেই মন্দিরতলা। চলে যাও।

মেয়েটা বলল, মন্দিরতলায় গিয়ে অবশ্য লাভ নেই। খেয়া বন্ধ। খেয়া থাকলে আমিই চলে যেতাম।

—আপনি, আপনি কোথায় যাবেন? আগ্রহে শুধায় শিবু।

মেয়েটা বলল, দেখুন না, কি বিপদেই পড়েছি। এখানে এসে আটকে পড়েছি। বিকেল থেকে খেয়া বন্ধ হয়ে আছে। কাল সকালের আগে আর যাবার উপায় নেই।

হাড়গিলের মতো বুড়োটা বলল, আমি যাব কচুবেড়ে। তা বাপু যা অবস্থা শুনছি তাতে কাল সকালের আগে ওদিকে এগোতে সাহস হচ্ছে না। শুনছি, ওদিকে নাকি এখনো প্রচুর জল? দস্তুরমতো জোয়ার-ভাঁটা খেলছে?

শিবু আবার দু-জনের মধ্যে সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করল, এরা তাহলে কেউ কারো চেনা নয়। বিপদে পড়ে এই ঝুপড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। বিপদে যে একসঙ্গে বাঘে গরুতে জল খায় এ রকম

একটা গল্প স্কুলের পাঠ্য বইয়ে পড়েছিল শিবু। সে কথাটা ওর মনে পড়ল।

বলল, আমিও তাহলে আপনাদেরই মতোই বাইরের লোক। আপত্তি না থাকলে আপনাদের সঙ্গে যদি থাকতে দেন। শুধু একপাশে বসে রাতটা কাটিয়ে দেব।

—দেখ হে, তোমাকে থাকতে দিতে আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু তোমার গা দিয়ে যা গন্ধ বেরুচ্ছে, অন্নপ্রাশনের ভাত বমি হয়ে আসবে।

মেয়েটা বলল, আপনি ঐ পাশের ডোবা থেকে ভাল করে চান করে আসুন আগে।

শিবু যেন হাতে স্বর্গ পেল। লোকটা বলল, তোমার তো খালি হাত-পা দেখছি! তোমাকে কিন্তু খাওয়াতে পারব না বাপু। মাথা গোজার ঠাঁই পাচ্ছ বলে মনে করো না, তোমাকে আমাদের খাওয়াতে হবে।

শিবু বলল না, না, খেতে দিতে হবে না। আপনারা যে থাকতে দিচ্ছেন এই ঢের।

মেয়েটা বলল, আপনি পেছন দিকে খানিকটা এগিয়ে যান, একটা ডোবা পাবেন। আপনার সঙ্গে শুকনো কাপড় তো কিছুই নেই দেখছি।

শিবু ম্লান একটু হাসে, এটাই শুকিয়ে নেব। সারাদিন তো গায়ে জল বসেছে, আর একটু না হয় বসবে। কিচ্ছু অসুবিধা হবে না।

শিবু লাঠি হাতে ডোবার দিকে এগিয়ে গেল।

বার

চারপাশ কেমন যেন থমথমে হয়ে আছে। এই রাতে পুব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ কিছুই বোঝার উপায় নেই। দিগন্তজোড়া কেবল রহস্য। হাতের লাঠিটা যে এ সময় কত প্রয়োজনীয় তা বলে বোঝাবার নয়।

লাঠিতে ভর করে পা টিপে-টিপে শিবু খানিকটা এগোল। ঘরের ঝাঁপিটা আবার ওরা বন্ধ করে দিয়েছে বোধহয়। চকিতে একবার পেছন ফিরে তাকাল শিবু, হ্যাঁ, বন্ধই করে দিয়েছে। দিক, আপত্তি নেই, কিন্তু কুপিটা হাতে পেলে সুবিধে হত। চাঁদের আলোয় চোখে যেন আরো ঘোলা লেগে যাচ্ছে ওর। কেমন ধোঁয়াটে স্বপ্নের মতো, সবকিছুই যেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে।

কুপিটা ঐ হাড়গিলে লোকটার হাত থেকে কিছুতেই সরানো যাবে না, শিবুর বুঝতে অসুবিধা হল না। সংসারে কিছু কিছু লোক ও রকমই হয়। তবু সন্দেহ নেই ঐ মেয়েটা ছিল বলেই শিবু এখানে আশ্রয় পেয়েছে। মেয়েটার ওপর কৃতজ্ঞ থাকবে শিবু।

আর একটু এগিয়ে এল। পায়ের নিচে অসম্ভব কাদা। লাঠি দিয়ে কাদা পরীক্ষা না করে এগোতে ভয় হয়। কে জানে কোথায় কোন গর্ত রয়ে গেছে কিনা। কোথায় কখন পা পড়লে হড়কে যাবে শিবু। বরং ধীরে চলাই ভালো। সত্যি সত্যি একটা ডোবা মতো চোখে পড়ল ওর। বন্যার জল জমেই বোধহয় অমন অবস্থা হয়েছে। অন্য সময় হলে এ জলে ডুব দেবার প্রশ্নই আসে না, কিন্তু এখন আর দ্বিতীয় পথ নেই। ঝুপড়িতে যদি রাত কাটাতে হয় এই জলেই ওকে কাপড় ভিজিয়ে উঠে আসতে হবে।

লাঠিটাকে ঠুকে কাদায় পুঁতে ফেলে শিবু। তারপর গায়ের জামা-কাপড় সমেত জলে কয়েক ধাপ নেমে আসে। কিন্তু গায়ের

শুকনো জামাটা কি ভেজান উচিত! আর একবার ঝুপড়িটার দিকে তাকায় শিবু। নাহ্ ধুয়েই নেয়া যাক। এই নিয়ে আবার লোকটার খিটিমিটি শোনার চেয়ে জামা-কাপড় সব কিছুই ধুয়ে নেওয়া যাক।

কিন্তু এ সময় মনে পড়ল, জামার পকেটে এখনো টাকা রয়েছে। টাকাগুলো জলে ভেজাম উচিত নয়। আবার জল ছেড়ে লাঠিটার কাছে উঠে আসে শিবু। জামার পকেট থেকে টাকাগুলো বার করে আনে। কোথাও এতটুকু শুকনো জায়গা নেই যে টাকাগুলো রাখে। মেয়েটার কাছে রেখে এলে হত। কিন্তু না, যত ভালো মেয়েই হোক টাকা-পয়সা নিয়ে এখন আর কাউকেই বিশ্বাস করা চলে না। বরং এই লাঠির গোড়াতেই রাখা ভাল। বাতাস নেই যে উড়ে যাবে। হালকা করে কাগজের নোটগুলি লাঠির গোড়ায় কাদার ওপর রেখে দেয় শিবু। তারপর আর দেরি না করে ডোবায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ডোবায় যত জল তত কাদা। কেমন একটা আঁশটে গন্ধ নাকে লাগে ওর। এ জলে জোঁক থাকাও অসম্ভব নয়। এটা যদি গরু মোষ চান করাবার ডোবা হয়ে থাকে, তাহলে ও রকমই হওয়ার কথা। জোঁকের ভয়ে শিবু তাড়াতাড়ি চান সারার চেষ্টা করল। দু-হাতে রগড়ে রগড়ে গা ঘষল। পায়ের ওপর পা ঘষে মড়া পাড়ানর বিটকেল গন্ধ তাড়াবার চেষ্টা করল। কাপড়-জামা ঝপাঝপ ধুয়ে নিল। কে জানে, এত করার পরেও ওর গা থেকে গন্ধটা গেল কিনা! জামাটা খুলে নিংড়ে নিয়ে গা মুছল শিবু। চুলগুলো আঠা-আঠা। যেন জট ধরে গেছে। চিরুনি নেই যে আঁচড়ে নেবে। চুলের ভাঁজে আঙুল ডুবিয়ে আঁচড়াবার চেষ্টা করে ও। তারপর জল ছেড়ে পারে এসে দাঁড়ায়।

আর ঠিক এই সময়ই ও আবার চমকে ওঠে, ডোবাটা খুব একটা বড় নয়। ঠিক ওপারেই ধকধক করে জ্বলছে কি ও দুটো! কোন জন্তু-জানোয়ারের চোখ নয় তো! রাতের অন্ধকারে জন্তুর চোখ

ওভাবেই জ্বলে। একটুক্ষণ থমকে রইল শিবু। সারা গায়ে কাঁপুনি খেলে গেল ওর। চোখ না আর কিছু! সত্যি সত্যি যদি কোন হিংস্র জন্তু হয়! এখান থেকে সুন্দরবন কতটুকুই বা পথ! বাঘ-ফাগ এসে দাঁড়ায় নি তো ওপাশে!

চোখ ফেরাতে পারল না শিবু। চোখদুটো স্থির হয়ে আছে। সন্দেহ নেই, কোন জন্তুরই চোখ। তাকিয়ে থাকে শিবু। মুখ দিয়ে একটা শব্দ করল, হুঁশ। কিন্তু একচুলও নড়ল না ওদুটো।

জন্তুই যদি হবে, তবে একটুও কি নড়াচড়া করতে পারে না। আবার ঝুপড়িটার দিকে তাকায় শিবু। ঝুপড়ির ভেতরে তেলের কুপিটা জ্বলছে বোঝা যায়, কিন্তু ঝাঁপ বন্ধ। হাড়গিলে বুড়োটাই ঝাঁপ বন্ধ করে রেখেছে। বুড়োটা বা মেয়েটা কারো নামই ওর জানা নেই যে নাম ধরে একবার ওদের ডাকবে। মহা সমস্যায় পড়ে গেল শিবু।

জন্তুর চোখ না হয়ে অন্য কিছু তো হতে পারে। অনেক মড়া ডিঙিয়ে এসেছে ও, তবে কি সেই সবই কোন ব্যাপার! সারা গা আবার কেমন ঝাঁকি খেয়ে উঠল ওর। নাহ্, আর দাঁড়ান ঠিক নয়। তাড়াতাড়ি পরনের কাপড়টা নিংড়ে নিয়ে একপাশ কোমরে জড়িয়ে নিল। টাকাগুলো তাড়াতাড়ি তুলে নিল। লাঠিটা শক্ত করে চেপে ধরল শিবু। তারপর দু-পা এক-প্রা করে পিছিয়ে এসে হঠাৎ দৌড়ে ঘরের কাছে চলে এল।

ভেবেছিল ঝাঁপটা ভেজান রয়েছে, ঠেললেই খুলে যাবে, কিন্তু না, ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছে।

শিবু প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, খুলুন, দরজা খুলুন। আমি চান করে এসেছি, খুলুন।

মেয়েটাই দরজা খুলল। শিবুর চোখে আতঙ্ক দেখে বিস্ময়ে তাকাল, কি হয়েছে?

শিবু ডোবার দিকে আঙুল তুলে চেঁচিয়ে উঠল, বাপরে, খুব

জোর বেঁচে গেছি। আগে জানলে কি ঐ ডোবায় যাই!

—কি, কি হয়েছে? বুড়োটাও হুমড়ি খেয়ে এগিয়ে এল।

শিবু উত্তেজনা দমাতে পারছিল না। বলল, চোখ। এক জোড়া ভীষণ চোখ। ধকধক করে জ্বলছে। চোখেরই মতো মনে হল।

বুড়োটা, আবার ভেতরে সরে গেল। তোমরা দরজা বন্ধ রাখবে? না, খুলেই রাখবে? তোমরা মরবে, আমাকেও মারবে।

মেয়েটা শুধাল, কোথায় চোখ? কার চোখ?

শিবু আবার ডোবার ওপাশে সেই চোখদুটাকে খুঁজতে শুরু করল। না, কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। ঐ ওখানে দেখেছিলাম। কী বীভৎসভাবে আমাকে দেখছিল।

মেয়েটাও ডোবার দিকে তাকাল, ধোঁয়ার মতো রহস্যময় চাঁদের আলো ছাড়া আর কিছুই নেই। কোথায়? কি রকম?

বুড়োটা আবার খিচখিচ করে উঠল, তোমরা কি ঝাঁপটাকে বন্ধ করবে, না ঐভাবে খুলে রেখে গল্প করবে। এখন শুনছ না, পরে ঠেলা বুঝবে বলে দিচ্ছি। এই মেয়ে!

শিবু বলল, মনে হচ্ছে পালিয়েছে। নির্ঘাৎ কোন হিংস্র জানোয়ার এসে ঐ ডোবার ওপাশে দাঁড়িয়েছিল। অন্ধকারে কেবল জ্বলন্ত চোখদুটোই দেখেছিলাম। রাতে জন্তু-জানোয়ারের চোখ ওভাবেই জ্বলে।

মেয়েটা ডাকল, ভেতরে আসুন। বন্ধই করে দিই।

শিবু ভেতরে ঢুকল। ভেজা কাপড়, ভেজা জামা। এখন এই ভাবেই বসে বসে বাকি রাতটা ওকে কাটাতে হবে। ডোবায় চান করে এসে ও ভাল করল কিনা কে জানে!

মেয়েটা শিবুর চেহারা দেখল, চান তো করলেন, কিন্তু ঐ ভেজা কাপড়েই এখন থাকতে হবে। বলতে বলতে বেড়ার আর একপাশে গিয়ে বসে পড়ল মেয়েটা।

ঘরের ভেতরটা ভাল করে দেখে নিল শিবু। স্যাঁতসেতে ভেজা

মেঝে। রক্ষে, ঘরের ভেতরেও কাদা নেই। কাপড়টার একটা অংশ, শুকোবার জন্য বেড়ার গায়ে মেলে দিলে কেমন হয়। বেড়ার দিকে তাকায় শিবু। লাঠিটাকে একপাশে দাঁড় করিয়ে রেখে ভেজা কাপড়ের একটা অংশ অতি সাবধানে বেড়ার গায়ে গুঁজে ছড়িয়ে দেয়। অপর অংশ থাকে ওর কোমরের সঙ্গে জড়ান। তারপর পা গুটিয়ে শিবুও একপাশে বসে পড়ে।

ওপাশে তেলের কুপির শিখায় দুটি-একটি পোকা লাফালাফি শুরু করছে। পোকাগুলির দিকে তাকিয়ে থাকে শিবু।

কিন্তু এখনো ও বিশ্বাসই করতে পারছে না, কী দেখে এল ও বাইরে। সারা রাস্তা মড়া ডিঙিয়ে এসেছে, তাতেও এত ভয় পায় নি ও, কিন্তু ডোবার ধারে কি ও-দুটো। সত্যি সত্যি কী কোন জন্তু, না কোন অশরীরী। অশরীরী কথাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অন্তত আজকের এই অভিজ্ঞতার পর কিছুতেই ও উড়িয়ে দিতে পারছে না।

বুড়োটা বলল, আর কিছু নয়, এসব কারণেই আমি সারাক্ষণ ঝাঁপ বন্ধ করে রাখতে বলি। আমাদের এই ঘরটা যে মহাশ্মশানের ওপর তা খেয়াল আছে?

—মহাশ্মশান!

—শ্মশান না? চারপাশে এত লোক মারা গেল। পচে দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করল, শ্মশান ছাড়া কি আর!

শিবু বলে, কিন্তু চোখ-দুটোকে আমার জানোয়ারের চোখ বলেই মনে হল।

বুড়োটা খিচখিচ করে উঠল, তাতো হবেই। সাধে আমি তোমাকে আগুন ছুঁতে বলেছিলাম।

শিবু চুপ করে থাকে এবার। মেয়েটাও কেমন ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকে।

বুড়োটা বসে থাকার লোক নয়, পুঁটলিটা টেনে নিয়ে ঘাঁটতে

শুরু করল। পুঁটলির ভেতর কি যেন হাতড়ে বেড়াতে শুরু করল। বুড়োটার ভাবভঙ্গি বড় অদ্ভুত।

শিবু মেয়েটার দিকে তাকায়। মেয়েটা এখানে এভাবে বড় বেমানান। কি করে যে এখানে এসে জুটল ও কে জানে!

—আপনার শীত লাগছে না? হঠাৎ প্রশ্ন করে মেয়েটি। যেন একটা কিছু বলা প্রয়োজন মনে করেই প্রশ্নটা করেছে।

শিবু হাসে, শীত লাগলেও তো কিছু করার নেই, তাছাড়া ও-সবে আমার অভ্যেস আছে।

—কিছু শুকনো খড়কুটো থাকলে জ্বালিয়ে আগুন পোহাতে পারতেন।

শিবু বলল, তাহলে তো এখন ঘরের বেড়াগুলোই পোড়াতে হয়। এছাড়া আর জ্বালাবার মতো কিছুই নেই।

—ওমা, ঘরের বেড়া বুঝি কেউ পোড়ায়! মেয়েটার চোখে বিস্ময়। নদীর পারে অবশ্য অনেক কাটফাট ভেসে এসেছে, কিন্তু সে-সব তো ভেজা, কাদা মাখা।

বুড়োটা আবার খিচখিচ করে ওঠে। বোধহয় এ ধরনের কথাবার্তা ওর ভাল লাগছে না। শিবুও আবার চুপ করে যায়।

আবার পুঁটলির ভেতর হাত ঢোকায় বুড়োটা, তারপর একটা ঠোঙা বার করে এনে কোলের ওপর রেখে মুড়ি চিবোতে শুরু করে। অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে শিবু।

মেয়েটাও যেন নতুন কিছু দেখছে।

মুড়িতো খাচ্ছে, একটু পরেই ওর জল তেষ্টা পেতে পারে। এ ঘরে জলের কোন ব্যবস্থা নেই। জল খেতে হলে ঐ ডোবাতে গিয়েই খেতে হবে। বুড়োটা কি করে দেখা যাক। শিবু বুড়োটার মুড়ি চিবোনর ভঙ্গি দেখতে থাকে।

গা দিয়ে এখনো দুর্গন্ধ উথলে উঠছে কিনা বোঝার উপায় নেই। ওরাও যখন এ ব্যাপারে আর উচ্চবাচ্য করছে না, শিবু বুঝল, গন্ধটা

হয়তো এরই মধ্যে ওদের গা সহা হয়ে গেছে, নয়তো উবে গেছে।

শব্দ করে মুড়ি চিবোতে চিবোতে হঠাৎ মেয়েটার দিকে তাকায় বুড়োটা, তুমি খাবে না?

মেয়েটারও যেন হুঁশ হয়, বলে, না, আপনি খাচ্ছেন, খান। ঐটুকু মুড়িতে আপনারই পেট ভরবে না।

বুড়োটা বোধহয় খুশিই হয়। তা অবশ্য ঠিক, মুড়ি খুবই কম। তোমরাতো কাল সকালেই মন্দিরতলা গিয়ে খাবার পেয়ে যাবে কিন্তু আমি যাবো উল্টোদিকে, আমার কি হবে কে জানে!

আবার আপন মনে মুড়ি চিবোতে থাকে বুড়োটা।

শিবু মেয়েটার দিকে তাকায়, মন্দিরতলা পার হয়ে আপনি কোথায় যাবেন? মেয়েটাকেই প্রশ্ন করে শিবু।

—আমাকে আবার আপনি কি, আমি অনেক ছোট। মেয়েটা কেমন অস্বস্তিবোধ করে।

শিবু বলে, আপনি-তুমিতে কিছু যায় আসে না। কোথায় বাড়ি তোমার?

মেয়েটা বলল, হেতমপুর। হেতমপুব চেনেন?

—হেতমপুর। শিবু উৎসাহে ভদ্র হয়ে বসে। হেতমপুরেই ওর শ্বশুরবাড়ি। যাক্‌বাবা অন্তত শ্বশুরবাড়ির দেশের একজনকে পাওয়া গেছে। শুধায়, হেতমপুরের রবি পালানকে চেন?

—হুঁ, খুব চিনি। মেয়েটাও আগ্রহে তাকায়।

—উনি আমার শ্বশুর।

—পুষ্প! পুষ্পর বর আপনি?

শিবুর সারা গা খুশিতে দোল খেয়ে ওঠে, হ্যাঁ পুষ্প। কেমন আছে ওরা? দেশের কোন খবর পেয়েছ? কী দুশ্চিন্তায় যে আমার সময় কাটছে, বলে বোঝাতে পারব না। নইলে কচুবেড়ে দিয়ে ঐভাবে বাউণ্ডারি ধরে হেঁটে আসি।

বুড়োটা মুড়ি চিবোতে চিবেতেে হঠাৎ থেমে যায়, এই গ্যাখো

তোমরা যে আত্মীয়তা বার করে ফেললে গো! যা হোক, একদিক থেকে তোমাদের ভালই হল।

মেয়েটা কথা কেড়ে নিল, আমাদেরই গাঁয়ে ওঁর শ্বশুরবাড়ি। আমাদের জানাশোনা। অথচ একেই তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন।

শিবুরও বেশ ভাল লাগে। তবু যাহোক একক্ষণ পর ওদের গাঁয়ের দিককার একজন লোককে পাওয়া গেছে। শুধায়, কেমন আছে সবাই, খবর পেয়েছ?

মেয়েটা বলে, বান ওদিকেও হয়েছে, তবে এধিককার মতো নয়। মাত্র তিন-চার ফুট নাকি জল উঠেছিল। ক্ষতি যা হওয়ার এদিকেই হয়েছে।

—তার মানে বাড়ি গিয়ে সবাইকে ভাল দেখব বলছ? শিবু উৎসাহে আবার ছটফট করে ওঠে, সারাটা রাস্তা যে কী দুশ্চিন্তার মধ্যে কেটেছে তা আর বলার নয়।

বুড়োটা বলে, সবই ভগবানের ইচ্ছা হে। তোমাদের তো যা হোক কিছু হল, আমার কপালে কি আছে, কে জানে!

শিবু সান্ত্বনা দেয়। বলে, আপনার কপালও ভাল।

—ভাল! বুড়োটা বাঁকাচোখে কুতকুত করে তাকায়, কেন, কি ভাল দেখলে? বুড়োর চিবুকের কাছে একটা মুড়ির টুকরো লেগে আছে। ভারি অদ্ভুত দেখাচ্ছে মুড়িটা

শিবু বলল, আমি একগাদা চিঁড়ে বেঁধে নিয়ে হাঁটা শুরু করেছিলাম, কিন্তু পুঁটলিটা রাস্তাতেই চুরি হয়ে গেছে। আর আপনার কপাল ভাল বলেই এখনো তা রাখতে পেরেছেন।

—এই ছ্যাখো, এটা একটা কথা হল! মুড়ি তো এইটুকুন, তাও শেষ হয়ে গেল। এবার এবার একটু জল খাওয়া দরকার।

—বাইরে গিয়ে খেয়ে আসুন। মেয়েটার দিকে তাকায় শিবু।

—বাইরে! বুড়োটা অসহায়ভাবে তাকায়। কিন্তু তুমি যে বললে একটু আগে কি সব দেখলে! এই বুড়ো বয়সে প্রাণ খোয়াব!

একটু আমার সঙ্গে চল না হে। চট করে জলটা খেয়ে আসি।

শিবু হাসবে না কাঁদবে। মনে হল, একটু বয়স বাড়লেই মানুষ স্বার্থপর হয়ে যায়। বলল, চলে যান না, দাঁড়াবার কি আছে।

—না মানে, এখন তো আর তোমাদের মতো গায়ে শক্তি নেই যে কিছু দেখে ফেলল সইতে পারব। ও ছেলে, একটু চল না আমার সঙ্গে। অনুনয় করে বুড়োটা।

শিবু আবার মেয়েটার দিকে তাকায়, তারপর বলে, ঠিক আছে, চলুন দাঁড়াচ্ছি।

শিবুই এগিয়ে এসে দরজা খুলল। বেড়ায় মেলে দেওয়া ভিজে কাপড়ের অংশটা আবার কোমরে জড়িয়ে নিল।

—লাঠি নেবে না?

শিবু অবাক হয়ে তাকায়, লাঠি, কি হবে। আপনি চট করে জলটা খেয়ে চলে আসুন, আমি দাঁড়াচ্ছি।

ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায় শিবু। বুড়োটাও।

—যান, চলে যান।

শিবু দেখল, অফুরন্ত চাঁদের আলো বিছিয়ে পড়েছে চারপাশে। চাঁদটা যেন সাদা কাপড়ে সমস্ত পৃথিবীটাকে মুড়িয়ে রেখেছে। ভারি সুন্দর ছবির মতো লাগে শিবুর। অথচ কিছুক্ষণ আগে এই চাঁদের আলোকে কত খারাপ লাগছিল ওর। তবে কি মেয়েটার সঙ্গে পরিচয় হল বলেই এত ভাল লাগছে। মেয়েটা ওর শ্বশুরবাড়ির লোক; মেয়েটার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে ওদের বাড়ির সবাই এখন ভাল আছে, এ কথা জানার পরই কি চাঁদের আলো এত ভাল লাগছে ওর।

বুড়োটা ততক্ষণে ডোবার দিকে এগিয়ে গেছে। শিবুও ডোবার দিকে তাকায়, ঐ পচা জল খেলে নির্ঘাৎ অসুখে পড়বে বুড়োটা, কিন্তু ও ছাড়া আর উপায়ও নেই তখন।

ডোবার দিকে চোখদুটোকে খুঁজতে শুরু করে শিবু। কই, দেখা

যাচ্ছে না তো! আঁতিপাতি করে এপাশ-ওপাশ কিছুক্ষণ খুঁজল। না, কোথাও নেই। হঠাৎ, ঐ তো বাউণ্ডারির দিকে, মাত্র হাত দশ-বারো দূরে ঐ তো চারপাঁচটা ঐ রকম ধকধক করা আলো। মাটিতে পড়ে আছে। কি ও-গুলো!

বুড়োটা ততক্ষণে আবার ঘরের দিকে ফিরতে শুরু করেছে। শিবু চেঁচিয়ে উঠল, ঐ, ঐ তো!

বুড়োটা প্রকাণ্ড একটা লাফ দিয়ে ছুটে এল শিবুর কাছে, কি? কে?

শিবু আঙুল তুলে দেখাল, ঐ যে! মাটিতে চকচক করছে, দেখছেন না?

বুড়োটা ঝুঁকে দেখবার চেষ্টা করল, তারপর শিবুর দিকে তাকাল, ও তো জল।

—জল!

—হ্যাঁ, ভিজে গাছের পাতায় চাঁদের আলো পড়ে ওরকম চকচক করছে।

—তাই কী! শিবু একটু সাহস পায় বুকে। তারপর দু-এক পা এগিয়ে গিয়ে অবাক হয়ে দেখে, তাই তো! এতক্ষণ তাহলে ও-গুলো দেখেই ভয় পেয়েছিলাম।

বুড়োটা হাত ধরে টানল শিবুর, চল, ঘরে চল। আর এখানে দাঁড়ান ঠিক নয়। রাতটা কেটে গেলে বাঁচি এবার।

আবার ওরা ফিরে আসে। ঝাঁপ বন্ধ করে দেয়। বুড়োটা আবার কাপড়ের পুঁটলিটার কাছে গিয়ে বসে পড়ে। মেয়েটা কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। এখনো নিশ্চয় রাত ভোর হতে অনেক বাকি।

তের

কুপিটার তেল ফুরিয়ে এসেছিল। বুড়োটা বলল, ওটা আমার! আমিই নিয়ে যাবো।

মুখ চাওয়াচাইয়ী করে শিবু আর মেয়েটা। মেয়েটা হাসে, ঘরের বেড়াগুলোও নিয়ে যেতে পারেন।

—ঠাট্টা করছে? কুপিটা আমারই চোখে পড়েছিল প্রথম। বুড়োটা যেন ঝগড়া করার জন্যে মুখিয়ে ওঠে।

শিবুও একটু হাসে, না না, আপনিই নেবেন।

কুপির দিকে ধাঁ ধাঁ করে একটা বড় আকারের পোকা ছুটে এসেছিল, পোকাটা কুপির শিখার সঙ্গে খেলা করতে লাগল।

বুড়োটা কাছে টেনে রাখল কুপিটাকে। তারপর কাউকে গ্রাহ্য না করে পা ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। খাওয়া দাওয়া হল, এবার নিদ্রা। শিবুর কেমন অদ্ভুত লাগে লোকটাকে। মানুষের বেশির ভাগই বোধহয় ও-রকম।

কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই মেয়েটা হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। শিবু তাকায়, কি হল?

—না, কিছু না। মাঝে মাঝে বানের কথা মনে পড়লেই গা কেমন শিউরে উঠছে।

—বান তো হয়েছে এদিকে। তুমি হেতমপুর ছেড়ে এখানে এলে কি করে? প্রশ্ন করে শিবু।

মেয়েটা বলে, সেটাই তো আমার ভাগ্য। কিভাবে যে এই বেড়ার ঘরে এসে পড়লাম সেটাই ভাবি। নেহাত পরমায়ু ছিল তাই বেঁচে গেছি।

শিবু তাকিয়ে থাকে, একটু খুলে বল না?

মেয়েটা বলে, কাকদ্বীপ ছাড়িয়ে শান্তিনগরে আমার মামার বাড়ি। মাসখানেক আগে মামার সঙ্গে ওখানে আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম। রোজই দেশে ফিরে যাওয়ার কথা বলি, তা আর হয়ে ওঠে না। মামা জমি-জায়গা নিয়ে এত ব্যস্ত মানুষ, সময়ই করে উঠতে পারেন না। আসলে আমার কপালে এসব লেখা ছিল তাই আর ফেরাই হচ্ছিল না।

শিবু শান্তিনগর চিনতে পারল না। এদিককার বেশিরভাগ গ্রামই ওর অচেনা। শুধাল, মামারা কোথায়? মামাদের ছেড়ে একা বেরিয়ে আসাটা তোমার উচিত হয় নি।

মেয়েটা বলল, বন্যার সেই রাতটায় যদি শান্তিনগরে থাকতেন, তাহলে বুঝতেন। সারাটি দিন টিপটিপ বৃষ্টি। মাঝে মাঝে ঝড়ো বাতাস, মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, এই বৃষ্টি বুঝি আর কোনদিনই থামবে না।

শিবুরও মনে পড়ে গেল গাইগাছির রাত্রিটার কথা। টিপটিপ বৃষ্টি। তারপর সেই ভয়ঙ্কর তুফান। ওর বিছানার ওপর ভয়ে কিরকম হয়ে গিয়েছিল সেই বেড়ালটা। উঠোনে টিনের চাল উড়ে এসে একটা কুকুরকে কেমন এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছিল। আর সেই ঝড়ের মধ্যে কেমনভাবে ফুল্লরা এগিয়ে এসেছিল ওর কাছে ছলাকলা দেখিয়ে।

ফুল্লরার কথা মনে পড়ায় আবার কেমন এক অস্বস্তি বোধ করে শিবু। অথচ এই অচেনা মেয়েটাকে দেখে তো ওরকম কিছু মনে হচ্ছে না। শিবু আবার সহজভাবে মেয়েটার দিকে তাকায়।

মেয়েটা বলে, রাতে প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয়ে গেল। ভাবলাম ঝড়েই বুঝি চাল-ফাল উড়িয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু ভাগ্য ভাল, সে রকম কিছুই ঘটল না। আমরা সবাই তখন এক ঘরে জড় হয়ে ভগবানের নাম জপছি, মাঝে মাঝে শাঁখে ফুঁ দিচ্ছি। তখন আমার কেবল বাড়ির কথাই মনে পড়ছিল। বাড়ির জন্য আমার কান্নাই পেয়ে গেল।

শিবু বলল, এ সময় বাড়ির সকলের সঙ্গে থাকতে না পারলে ও-রকমই হয়। আমারও হয়েছিল।

মেয়েটা শুধাল, আপনি কোথায় ছিলেন ঝড়ের সময়?

শিবু বলল, গাইগাছি। কাকদ্বীপ নামখানা হয়ে যেতে হয়। তাছাড়া গাইগাছিতে যে বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলাম সেই বাড়িটাও বড় অদ্ভুত। সারা বাড়িতে মাত্র দু-জন লোক। একটা বুড়ো আর একটা তার স্ত্রী। বুড়োর নাম মধুসূদন গিরি, আমাদের সঙ্গে আগে থেকেই তাঁর জানাশোনা ছিল।

—ওদিকে বান হয় নি?

শিবু বলল, হয়েছে, তবে এদিককার মতো এমন সাংঘাতিক না। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি পালিয়ে এসেছি। বাড়ির জন্য আমারও কান্না পাচ্ছিল সে সময়।

কুপিটার গায়ে একটা পোকা আটকে গেছে। পোকাটা ছটফট করছে। শিবু একটু ঝুঁকে পোকাটাকে টোকা দিয়ে সরিয়ে দিল।

ওদিকে বুড়োটা ততক্ষণে বিশাল লম্বা হয়ে উঠেছে। ঘুমুচ্ছে বোধহয়। চোখ বোজা, মুখটা হাঁ হয়ে আছে।

মেয়েটা বলল, শান্তিনগরে যা বান হয়েছে, তাতে ওদিকে একটা বাড়িও আস্ত নেই। শেষরাতের দিকে ঝড়ের দমকা কমে এলে জল বাড়তে শুরু করল। জলের কী শব্দ, এখনো যেন কানে লেগে আছে। প্রথম দিকে আমরা বুঝতেই পারি নি ওটা জলের শব্দ, কিন্তু কিছুক্ষণ পর অবস্থাটা যখন বোঝা গেল, তখন কান্নাকাটি পড়ে গেল ঘরের মধ্যে। মামা তখন সবাইকে ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির চালে ওঠবার জন্যে তাড়া লাগালেন। চালে ওঠার জন্য একটা মই লাগিয়ে দিলেন।

তখনো বৃষ্টি। সেই বৃষ্টির মধ্যেই ভিজতে ভিজতে চালে উঠলাম। কিন্তু চালের ওপর বসা দায়, কী ঠাণ্ডা বাতাস। ছুরির ফলার মতো যেন গায়ে বিঁধছিল। চালের ওপর হুমড়ি খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

চারদিকে তখন প্রচণ্ড প্রলয়। কী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব ঢেউ

বাড়িটাকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে। দেখতে দেখতে বাড়ির অর্ধেকটা ডুবে গেল। এইভাবে যদি জল বাড়ে, তাহলে ভোর হওয়ার আগেই পুরোটা ডুবে যাবে। ভয়ে আমাদের কান্নাকাটি চেঁচামচি আরো বেড়ে গেল। মামার তখন পাগলের মতো অবস্থা। ঘরের ভেতর থেকে ততক্ষণে বিছানাপত্র বাক্স-পেটরা সব ভেসে যেতে শুরু করেছে। চোখের সামনেই এইসব ঘটছে, অথচ কিছুই করার নেই।

সকালের দিকে অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেল। কাণায় কাণায় বাড়িটা জলের নিচে চলে গেল। হঠাৎ আবার মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড সব ঢেউ এসে তাড়া লাগাচ্ছিল আমাদের। কোনক্রমে চালের খড় আঁকড়ে ধরে দু-একটা ঢেউ সামলে উঠলাম। কিন্তু কখন যে আমাদের বাড়ির দেওয়াল ভেঙে পড়েছিল আমরা টের পাই নি। এক সময় বুঝতে পারলাম, বাড়ির চালটা বাড়ি থেকে আলাদা হয়ে ভাসছে।

আমরাও ভাসতে শুরু করলাম। তারপর কে যে কোথায় হারিয়ে গেলাম কে জানে!

ঘণ্টা তিন-চারেক হয়তো ঐভাবে জলের উপর খড়কুটোর মতো ভেসেছিলাম। জ্ঞানও হারিয়ে ফেলেছিলাম, তারপর এক সময় যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি, একটা ঢিবিমতো উঁচু জায়গায় কাদার ওপর আমি পড়ে আছি। চারপাশে তখনও জল, কিন্তু সে জলে ডুবে মরার ভয় নেই। ফলে, বিকেল অবধি সেখানেই অপেক্ষা করলাম। তারপর রাত হয়ে আসছে দেখে ভয়ে জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম।

সারারাত বোধহয় পাগলের মতো মানুষের মুখ দেখবার জন্য জলে কাদায় হেঁটেছি। কিন্তু হাঁটাই সার হয়েছে। ক্ষিধেয় তখন আর দাঁড়িয়ে থাকার উপায় ছিল না। পা-দুটো আর চলছিল না। বারে বারে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিলাম। ভাগ্য ভাল, ভোরের দিকে কয়েকজন লোকের দেখা পেলাম। তাদেরও আমারই মতো অবস্থা। তবু দয়া করে লোকগুলি আমাকে কিছু ভেজা চিঁড়ে খেতে দিল। তারপর

আমাকে ওরা এদিককার এই রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল।

আবার হাঁটতে শুরু করেছিলাম। কেবল আকাশের দিকে তাকাই, আর নদীর দিকে তাকাই। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় সন্ধ্যের মুখে এই ঘরটার দেখা পেলাম।

বুড়োটার দিকে আঙুল তুলে শিবু শুধাল, ও বুঝি আগেই এখানে ঠাঁই নিয়েছিল ?

মেয়েটা বলল, হ্যাঁ। আমার কপাল ভাল আমাকে ও ভূতটুত ভাবে নি। তাছাড়া একা রাত কাটাতে হবে ভয়ে ও আমাকে পেয়ে খুশিই হয়েছিল।

ওরা দু-জনেই আবার বুড়োটার দিকে তাকায়। বুড়োটা হ্যাঁ করে আছে। ভারি অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

শিবু ফিসফিস করে বলল, আমি কিন্তু একা-একা ওভাবে মুড়ি চিবোতে পারতাম না। লোকটা ভীষণ স্বার্থপর।

মেয়েটা বলল, মন্দিরতলায় খেয়া বন্ধ, নইলে আমি অনেক আগেই এখান থেকে চলে যেতাম।

—জানলে কি করে, খেয়া যে বন্ধ ? প্রশ্ন করে শিবু।

মেয়েটা বলে, আপনি আসার আগে জনা-তিনেক লোক এসেছিল মন্দিরতলার দিক থেকে। যাবে কাকদ্বীপ। তারাই বলল। তাদের মুখেই আমাদের গ্রামের দিককার খবর পেয়েছি। ওরাই বলে গেল, রাতটা কোনরকমে এখানে কাটিয়ে সকালে মন্দিরতলা গেলে খেয়া পেতে পারি।

শিবু বলল, ভালই হল। একটাই তো রাতের ব্যাপার। কাল সকালে একসঙ্গেই বেরুন যাবে। তোমাকে বরং আমি হেতমপুরে পৌঁছে দিয়ে আসব।

মেয়েটার চোখ ছলছল করে উঠল। কেউ যে ওকে সাহায্য করবে, এ কথা ভাবতেই বুঝি ওর বুকের ভেতর উথলে উঠল।

শিবু বলল, আর যাই হোক, খুব একটা অভিজ্ঞতা হল আমাদের।

এই দু-দিনে আমরা কত রকমের যে লোক দেখলাম তার শেষ নেই।

মেয়েটা আঁচল দিয়ে চোখ মোছে। তারপর কুপিটার দিকে আবার তাকিয়ে থাকে।

কুপিটা দপদপ করে লাফাচ্ছে। ওর তেল যে ফুরিয়ে গেছে সন্দেহ নেই। এখন যে কোন মুহূর্তে ওটা নিভে যাবে।

শিবু বলল, আমি কোনদিন ভগবান-টগবান বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু এখন করি।

—কেন? মেয়েটা কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

ভারি সরল চোখের চাহনী। শিবু বলল, ভগবানের অসীম করুণা ছাড়া এ অবস্থায় কেউ বাঁচতে পারে না। তাছাড়া তুমি যে ভাবে বেঁচে এলে, তা তো ভাবাই যায় না। তোমার মামা-মামীরা এখনো বেঁচে আছে কিনা কে জানে!

আলোটা নিভেই গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘন অন্ধকার এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘরের ভেতর। শিবু চুপ করে যায়। মেয়েটাও। বুড়োটা নির্ঘাৎ ঘুমিয়েছে, নইলে হৈ-হৈ করে উঠত এ সময়।

কিছুক্ষণ পর শিবু বেড়ার গায়ে দেহটা ঝুঁকিয়ে দিল। এইভাবেই চোখ বুজে রাতটা কাটিয়ে দিতে হবে। চোখ বুজল শিবু। অন্ধকারের সঙ্গে নিস্তব্ধতায় কোথায় যেন একটা সম্পর্ক আছে। আর এ নিস্তব্ধতার যেন শেষ নেই। এর মধ্যে কান পাতলে মহাকালও ধরা পড়ে। মানুষ যে কত নগণ্য তা বোঝা যায়।

শিবুর কেমন অস্বস্তি লাগতে থাকে এই অন্ধকার। এতক্ষণ তবু গল্প করা যাচ্ছিল। হঠাৎ মনে হল, কার সঙ্গে গল্প করছিল ও। এই ঝুপড়ির মধ্যে এই দুটি মানুষ, এরা সত্যি সত্যি জীবিত তো! কেমন আড়ষ্ট হয়ে পড়ে শিবু।

কিন্তু মেয়েটার অস্তিত্ব ও বুঝতে পারছে। ওপাশে ঐ তো ওখানে ও ছলছল চোখে বসে আছে। হয়তো ওরই দিকে তাকিয়ে আছে। ঘন অন্ধকারের ভেতরেও মানুষ অনেক স্পষ্ট হয়ে যায়।

গাইগাছিতে ঝড়ের মধ্যে আলোটা নিভে গিয়েছিল বলেই কি ফুল্লরা নিজেকে অমনভাবে প্রকাশ করেছিল।

এই দেখ, আবার ফুল্লরার কথা মনে পড়ল। অন্ধকার হলেই কী ঐভাবে ফুল্লরার কথা মনে পড়বে। শিবু দগদগে চোখে তাকায়। নড়াচড়া করতেও কেমন ভয় হয় ওর। অথচ বেড়া থেকে কাপড়টা এখন খুলে নিয়ে শুকনো দিকটা পরে নিতে পারলে ভাল হত। কিন্তু উঠতে সাহস হল না। মেয়েটা কী ঠায় বসে আছে। হাঁ করে কী ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। কী ভাবছে এখন। কী ভাবতে পারে এসময়।

শিবু চোখ বুজল আবার। ফুল্লরা এখন কি করছে। গাইগাছি কী এতক্ষণে বানের জলে ভেসে গেছে। যদি ওরকম কিছু হয়ে থাকে, মধুসূদনবাবু কী বেঁচে আছে। ওর যা শরীরের অবস্থা জলের একটা ধাক্কাতেই তো ওর শেষ হয়ে যাওয়ার কথা।

গাইগাছিতে নতুন করে আর কিছু হয়েছে বলে মনে হয় না। যা হওয়ার সে দিনই হয়েছে। তারপর থেকে আকাশ অনেক পরিষ্কার হয়ে এসেছে। তাহলে মধুবাবুকে কী আবার ঘুমের ওষুধ খাইয়ে এখন ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে ফুল্লরা। ঘুম পাড়িয়ে রেখে এখন কী করছে ফুল্লরা। শিবু যে ঘরে রাত কাটিয়েছিল, সে ঘরে কী এখন অন্য আর একজন কেউ শুয়ে আছে। ধুত্, কী সব আজেবাজে কথা মাথায় আসছে ওর।

অন্য প্রসঙ্গে মন দেওয়ার চেষ্টা করে শিবু। যে রাস্তা দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে শিবু এই ঝুপড়িতে এসে আশ্রয় পেয়েছে সেই রস্তাটার কথা ওর মনে পড়ল। পুঁটলির মধ্য থেকে সেই বাচ্চাটা কী বেরিয়ে পড়ে এখন নদীর কাদায় হামাগুড়ি দিয়ে তার মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বাচ্চাটা কী সত্যি সত্যি বেঁচে আছে। তখন কী শিবুকে দেখে ও ডুকরে উঠেছিল। শিবু অমন কাপুরুষের মতো পালিয়ে এল কেন। শিবু অমন অন্যায় করল কেন।

পরক্ষণেই মনে হল, ওর মা-ই যদি ওকে ফেলে রেখে ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে রাখতে চায় শিবুরই বা দোষ কোথায়।

—শিবুদা ?

হঠাৎই আবার চমকে ওঠে শিবু। হ্যাঁ, ওপাশ থেকে মেয়েটাই ওর নাম ধরে ডেকে উঠেছে। মেয়েটা তাহলে ঘুমোয় নি।

শিবু উত্তর করল, কি হল ?

—আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন না তো ?

—নাম। ও হ্যাঁ, তোমার নামটাই জানা হয় নি।

—আমার নাম সাবিত্রী। বাড়ির সবাই আমাকে সাবি বলে ডাকে। হেতমপুরে সাবিদের বাড়ি বললে সবাই চিনবে।

—তাই নাকি। তুমি খুব বিখ্যাত লোক তাহলে।

সাবিত্রী ককিয়ে ওঠে, ঠাট্টা করছেন ?

গলার স্বরটা কী ফুল্লরার মতো শোনাল। শিবুর সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিল শিবু, সাবিত্রী নামটা কিন্তু ভাল।

—ভাল না ছাই। আপনার ক্ষিধে পায়নি শিবুদা ?

শিবু শুধাল, তোমার ?

সাবিত্রী বলল, আর তো সামান্য কিছুটা রাত। আমাব অসুবিধা হবে না।

শিবু বলল, আমারও অসুবিধে হবে না। দুপুরে আমি পেট ভরে খেয়ে নিয়েছিলাম কাকদ্বীপে। তুমিই বরং দু-দিন না খেয়ে আছ।

—না না, তাতে কি। তবু ভাগ্য ভাল, আপনার দেখা পেয়েছি। এ সময় জানাশোনা লোকের মুখ দেখলে সব কষ্ট চলে যায়।

সাবি কী নিজের জায়গাতেই বসে আছে, না এগিয়ে আসছে।

শিবু একটু থমকে থাকে, পরে বলে, বুড়োটা কিন্তু নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। তাই না ?

সাবিত্রী বলল, অল্প অল্প নাক ডাকছে।

—একা একা লোকটা মুড়িগুলো খেয়ে গেল। ও থেকে কিন্তু খানিকটা তোমাকে ও দিতে পারত।

—না না শিবুদা, লোকটারও নিশ্চয়ই খুব ক্ষিদে পেয়েছিল। কাল সকালে আমরা ঘাটে গিয়েই খাবার পেয়ে যাব।

শিবু জানে, সঙ্গে যখন টাকা আছে দোকান পেলে অসুবিধা হবে না। বলল, এখনি যদি আমরা খেয়াঘাটে চলে যাই, দোকান পাব না? দোকান না পাই কাউকে গিয়ে অবস্থাটা বুঝিয়ে বললে কি চিঁড়েমুড়ি পাব না? না হয়, আমরা পয়সা দিয়েই কিনে নেব।

সাবিত্রী বলল, খেয়াঘাটের অবস্থা যদি ভাল থাকত, তাহলে অনেক আগেই আমি চলে যেতাম। ভোর হওয়ার আগে কোথাও যাওয়াটা আমাদের ঠিক নয় শিবুদা।

—তা অবশ্য ঠিক। এখন এই আশ্রয় ছেড়ে দিলে আবার কোন বিপদে পড়ব কে জানে!

বেড়ার ফাঁক দিয়ে বিন্দু বিন্দু চাঁদের আলো ঘরে ঢুকছে দেখতে পেল শিবু। চন্দনের টিপের মতো কয়েকটা ফোঁটা। সরু রেখার মতো কয়েকটা দাগ।

ঘরের বেড়ায় যে অসংখ্য ছিদ্র হয়ে আছে এই প্রথম নজরে পড়ল ওর। বাইরে পৃথিবী নিশ্চয়ই এখন চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে।

বুড়োটার শ্বাস টানার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে এবার। গলার শ্লেষ্মা পার হয়ে ফ্যাসফ্যাস করে শব্দটা ক্রমশ যেন বাড়ছে।

সাবিত্রী একটু নড়েচড়ে বসে, বুড়োটার দিকে তাকায়, আশ্চর্য, এভাবে কেউ ঘুমুতে পারে! লোকটা ভারি অদ্ভুত।

শিবুও হাই কাটে, মাথাটা বেড়ার গায় ঠেকিয়ে রাখে। মাথার ভিতর দপদপ করছে বুঝতে পারে শিবু।

চোদ্দ

আবার স্তব্ধতা নেমে এল। এ স্তব্ধতা বড় ভয়ানক। শিবু চোখ বুজে থাকতে পারল না। আবার চোখ খুলল। ঘরের ভেতরকার অন্ধকার এখন অনেক চোখ-সহা হয়ে এসেছে। আবছা মূর্তির মতো রহস্যময় সাবিত্রী আর বুড়োটাকে দেখা যাচ্ছে। বুড়োটা ঘুমুচ্ছে, কিন্তু সাবিত্রী। সাবিত্রীও কী ঘুমিয়ে পড়ল! অসম্ভব, সারাদিন যার পেটে কিছু পড়েনি, তার পক্ষে এ জায়গায় এভাবে ঘুমোন সম্ভব নয়। দুপুরে অত হুড়োহুড়ি করে খেয়ে নিয়েছিল শিবু, তবু ক্ষিধেয় এখন সমস্ত শরীরে ওর অবসাদ গড়াচ্ছে। হাজার চেষ্টা করলেও শিবু এ অবস্থায় ঘুমুতে পারবে না।

কে জানে রাত কত! মাঝরাত যে সন্দেহ নেই। এখনো কয়েক ঘণ্টা ওদের এইভাবেই কাটাতে হবে এখানে। স্যাঁতসেঁতে ভেজা কাপড়ে বসে থাকলে না জানি জ্বরেই পড়ে যায় শিবু। ঠাণ্ডায় গলার কাছে কি ব্যথাব্যথা করছে। গলার ওপর হাতের চেটো বিছিয়ে রাখে শিবু। এখন সত্যি সত্যি কোন আগুনের কুণ্ডলীর কাছে বসতে পারলে আরাম পাওয়া যেত, কিন্তু অসহায়ভাবে চারপাশে আবার তাকায়, তেলের কুপিটাও এখন পাওয়া যাবে না। এই ভাবেই বাকি রাতটা কাটাতে হবে ওকে।

এই গভীর রাতে পুষ্পও কী ওর জন্য জেগে বসে আছে। পুষ্প কী সারাক্ষণ জেগে বসে মিছিমিছি কেবল অমঙ্গল চিন্তা করছে! পুষ্প হয়তো ভাবছে শিবুকে বানের জলে ভাসিয়েই নিয়ে গেছে। কাল যখন পুষ্পর সামনে গিয়ে সশরীরে দাঁড়াবে শিবু, বেশ মজা হবে তখন। পুষ্প বিশ্বাসই করবে না, এই সাংঘাতিক বন্যায় ভেসে গিয়েও আবার ফিরে এসেছে শিবু। হয়তো আনন্দে ঝরঝর করে কেঁদেই

ফেলবে পুষ্প। তবু ভাল, পুষ্প নিজের চোখে নদীর পারে অত মড়া দেখেনি। দেখলে বুঝতে পারত, কী ভয়াবহ ঘটনা ঘটে গেছে এদিকে। প্রকৃতি কী ভীষণ হতে পারে চোখে না দেখলে কে বিশ্বাস করবে!

মনে পড়ে গেল, পুষ্প চায়নি শিবু ওকে একা রেখে গোশিঙা যায়। এই নিয়ে ওদের মধ্যে বেশ কথা কাটাকাটিও হয়েছিল। পুষ্প বলেছিল, আমার চেয়ে কৃষক সমিতিই বড় হল তোমার? তুমি কী মানুষ বলো তো!

শিবু হেসেছিল, কেউ কারো চেয়ে বড় নয়। তোমাকে বাদ দিয়ে আমি যেমন কিছুই না, তেমনি কৃষক সমিতিকে বাদ দিয়েও আমরা কিছুই না। গভীর বিশ্বাস থেকে বলেছিল শিবু।

আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল, পুষ্পর সঙ্গে কৃষক সমিতির তুলনাই চলে না। পুষ্প পুষ্পই, আর কৃষক সমিতি কৃষক সমিতিই। তবু কৃষক সমিতির অতবড় একটা সম্মেলন এত কাছেই হচ্ছে শুনে নিজেকে আর সংযত রাখতে পারেনি শিবু। কিন্তু দুর্যোগে সেই কৃষক সম্মেলন হল না, মাঝখান থেকে পুষ্পকেই মিছিমিছি কেবল কষ্ট দিল শিবু।

পুষ্পকে সঙ্গে নিয়ে বেরুতে আপত্তি ছিল না ওর। কিন্তু বেরুবার মতো অবস্থা ছিল না। পুষ্পর পেটের শিশুটি এ কদিনে আরো কত বড় হয়ে উঠেছে কে জানে! শিশুটির কথা মনে পড়ায় আবার উশখুশ করে নড়েচড়ে বসে শিবু। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখের ওপর ভেসে ওঠে নদীর পারে কাপড়ের পুঁটলিতে জড়িয়ে রাখা মুখটির কথা। সেই শিশুটি কী সত্যি সত্যি বেঁচে ছিল! শিশুটি কী এখন কাপড়ের পুঁটলির ভিতর থেকে বেরিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে কাদার ওপর গড়াচ্ছে। কি জানি, শিবু শিশুটির কাছ থেকে পালিয়ে এসে অন্যায় করল কিনা! না, ভালোই করেছে শিবু। বাচ্চাটিকে কুড়িয়ে নিলে আরো বিপদের মধ্যে পড়ে যেত ও। মা-ই যখন

ওভাবে ফেলে রেখে প্রাণের দায়ে পালিয়ে যেতে পারে, শিবুর সাধ্য কি তাকে বাঁচায়।

আবার একটু নড়েচড়ে বসে শিবু। সাবিত্রীর দিকে তাকায়। ঝিম ধরে বসে আছে মেয়েটা। একে মেয়ে, তায় এই বিরাট পৃথিবীতে ও এখন একা। ওর মনের অবস্থা কেমন হতে পারে। শিবু তো সেদিক থেকে অনেক ভাগ্যবান। বানের আসল ধকলটার মধ্যে পড়তে হয়নি ওকে। বাড়ির চালের ওপর থেকে বন্যার জলে ওকে ভাসিয়েও নিয়ে যায়নি। তাছাড়া মেয়েটার মতো শূন্য পেটেও থাকতে হয়নি ওকে। বরং শিবুর ভাগ্য ভাল, গতকাল রাতেও ও আশ্রয় পেয়েছিল, আজও। কাকদ্বীপের অমন নরককুণ্ডের মধ্যেও এক পেট খেয়ে নিয়েছে শিবু।

ভেবে রাখল, মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে ও নিজেদের বাড়িতেই হাজির হবে। পরে সেখান থেকে অবস্থা বুঝে ওকে হেতমপুরে পৌঁছে দিয়ে আসবে। চাই কি সে সময় পুষ্পকেও সঙ্গে নিয়ে শ্বশুরবাড়ির দিকে রওনা দিতে পারে শিবু। ব্যাপারটা বেশ ভালই হবে। সাবিত্রীকে দেখলে পুষ্প নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে। পুষ্প ভাবতেই পারবে না, এভাবে সাবিত্রীর সঙ্গে ওর কোনদিন দেখা হয়ে যেতে পারে। আর সাবিত্রীকে নিয়ে ওদের বাড়ির উঠোনে হাজির হলে কেমন দৃশ্য হবে মনে মনে কল্পনা করে বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করে শিবু। তারপর হঠাৎ কি খেয়াল হওয়ায় ডাকে, সাবিত্রী! ঘুমুলে?

শিবুর মনে হল সাবিত্রী ঘুমোয় নি, কিন্তু কোন উত্তর এল না।

না কি সত্যি সত্যি ও ঘুমিয়েই পড়ল। ঘুমিয়েছে, না ঘুমের ভান ধরে আছে। মেয়েরা না পারে হেন-কাজ নেই।

আবার ডাকল, ঘুমুলে?

নাহ্ ঘুমিয়েই পড়েছে। কিংবা শারীরিক ক্লান্তিতেই হয়তো ঝিম ধরে আছে, কিছুই শুনতে পাচ্ছে না এখন। দোষ দেওয়া যায় না

ওকে। একে না খাওয়া, তায় এত ধকল আর উত্তেজনা। শিবু আর ডাকল না। যতক্ষণ এইভাবে ও থাকতে পারে ততক্ষণই যেন স্বস্তি। সজ্ঞানে থাকলেই তো কষ্ট। বরং বেশ আছে, থাক।

পরক্ষণেই আবার মনে হল, মরে যায়নি তো মেয়েটা! মানুষের মরে যাওয়া ব্যাপারটায় আর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই ওর। নইলে সেই স্কুলবাড়ির টুনি, চোখদুটো এখনো ভুলবার নয়। কেমন জুলজুল করে এখনো যেন তাকিয়ে আছে মেয়েটা! অথচ ওর মা ওই মরা মেয়েকে কিছুতেই কোল ছাড়া করতে রাজি নয়। মানুষ তো কোন্ ছাড়, মনে পড়ল, বাছুর মরে গেলেও গরুকে কেমন করে শান্ত রাখতে হয়।

ধুত্ কি সব আবোলতাবোল কথা মাথায় আসছে। সাবিত্রীর মরে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। কালই তো ও স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে ফিরে যাবে। যত কিছু বিপদ-আপদ দুর্ভোগ সবই তো পার হয়ে এসেছে ওরা। এরকম অবস্থায় মরবার ইচ্ছে থাকলেও কেউ মরতে পারে না।

তবু নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য আবার ওকে ডাকতে গিয়ে থেমে গেল শিবু। বেড়া থেকে ভেজা কাপড়টাকে টেনে নামিয়ে আনল। কাপড়টা জবজব করছে এখনো ভেজা। ভেজা কাপড়টাকেই আবার ও কোমরে জড়িয়ে নিল। কাপড়টা ওর দেহের উত্তাপেই হয়তো শেষপর্যন্ত শুকিয়ে যাবে। কিন্তু জামাটা! অসম্ভব, এ জামা গায়ে দেওয়া চলে না। তাছাড়া কেমন একটা বিশ্রী গন্ধও জড়িয়ে আছে জামার মধ্যে।

জামাটা নিংড়ে আর একবার জল বার করার চেষ্টা করে শিবু। কিন্তু এক ফোঁটাও জল বেরুল না। আবার ওটাকে বেড়ার গায়েই মেলে দেয়। অল্প একটু রোদ পেলেই হয়তো শুকিয়ে নেওয়া যেত, কিন্তু মনে হল, রোদের মতো দুর্লভ এ পৃথিবীতে আর কিছুই নেই।

শিবু পা ছড়িয়ে দিল সামনের দিকে। এই ভেজা মেঝের ওপর

কী ভাবে যে বুড়োটা টান-টান হয়ে ঘুমুচ্ছে ভাবতেই অবাক লাগে। অথচ ওবও একটু ঘুমিয়ে নিতে পারলে ভাল হত। শিবু বসে বসেই আরো আয়েশ করে বেড়ার দিকে গা এলিয়ে দিল। তারপর আবার চোখ বুজল শিবু।

ঐভাবে বেড়ার গায় মাথা রেখে বসে আরো অনেকক্ষণ কেটে গেল ওর। কেমন একটা অবসাদে সমস্ত শরীর যেন ভেঙে আসছে। ঝিমুনি আসছিল ওর। বেড়ার গায়েই ঢুলতে ঢুলতে আরো কিছুক্ষণ পার হয়ে গেল। অকস্মাৎ শিবুর মনে হল, নদীর দিক থেকে হঠাৎ যেন শঙ্খধ্বনি ভেসে আসছে। গুরুগম্ভীর অদ্ভুত একটা শব্দ। মিথ্যে নয়, স্পষ্টভাবে শব্দটাকে অনুভব করতে পারছে শিবু। সমস্ত শরীর কেমন ঝিমঝিম করে কাঁপতে শুরু করল ওর। যেন কোন ধ্যান-গম্ভীর প্রাগৈতিহাসিক পুরুষ নদীর পারে আসনে বসে নাভিকুণ্ডলী থেকে শব্দটাকে বার করে আনছেন। চোখ মেলে তাকানো সম্ভব নয়। এখনি হয়তো সমস্ত গম্ভীর পরিবেশটা কেটে যাবে। এখনি হয়তো শিবু নদীটাকে ভিন্ন কোন চেহারায় দেখতে পাবে। ফলে শিথিলভাবে সমস্ত জাগতিক অনুভূতিগুলিকে আরো কিছুক্ষণ সীমার বাইরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে শিবু। চোখ বুজেই পড়ে থাকে ও।

শব্দটা ওকে প্রচণ্ডভাবে ঘিরে ধরল। যেন বেশ কিছুক্ষণ ওকে মহাশূন্যে ভাসিয়ে রাখল। তারপর অকস্মাৎ আবার পতন ঘটল ওর। আর্তনাদ করে উঠল শিবু। ওর তন্দ্রাভাবটা কেটে গেল।

চোখ মেলে তাকাল। কী আশ্চর্য, সমস্ত ঘরে চাঁদের আলোর আলপনা। সেই আলপনার মধ্যে বিকৃত ভঙ্গী নিয়ে অদ্ভুতভাবে গুটিয়ে পড়ে আছে বুড়োটা আর ওপাশে সাবিত্রীও। সাবিত্রীর বুকের ওপর বিছোন হাতের আঙুল। আগোছালো চুলের ঢল নেমে এসেছে মুখের ওপর। ভারী সুন্দর এই দৃশ্য। চোখ ফেরাতে পারল না শিবু।

মেয়েটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওর মনে হল, কত নির্ভয়ে এই অচেনা পরিবেশে ঘুমুচ্ছে মেয়েটা। আশ্চর্য!

কিন্তু ডাকতে সাহস হল না সাবিত্রীকে। এখনি হয়তো ওর এই অপুর্ব রমণীয় ভঙ্গিটা হারিয়ে যাবে। এখনি হয়তো সাবিত্রী নিজেকে পুরোপুরি ফিরে পেয়ে ককিয়ে উঠবে ক্ষুধায়। অভুক্ত এই মেয়ে, কে বলবে, দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে কি না!

শিবু চোখ ফিরিয়ে নিল। বড় অশোভন হচ্ছে এভাবে তাকিয়ে থাকা। ঘরের ঝাঁপির দিকে তাকাল। বাইরে সমস্ত ভুবন এখন আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছে। রাতও বোধহয় শেষ হয়ে এসেছে। ঘরের ভিতর এ সময় বসে থাকার চেয়ে বাইরেটাই বুঝি ভাল!

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল শিবু। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল বাইরে।

সত্যি সত্যি বিশাল চাঁদ উঠেছে আকাশে। স্নিগ্ধ আলোয় সমস্ত চরাচর ভেসে যাচ্ছে। আহ, কী অপূর্ব ওই বাউণ্ডারির ওপাশে নদী। সহস্র মণি-মুক্তো ছড়ানো নদী-স্রোতের সত্যি সত্যি তুলনা নেই। কে বলবে এই নদীই কী সর্বনাশা হয়েছিল বন্যার সময়। কে বিশ্বাস করবে, নদীর ধারে ধারে এখনো ক্ষিস্তূত সব মৃতদেহ পড়ে আছে।

ঝাঁপিটা আবার আলতো করে টেনে বন্ধ করে দিল শিবু। ওরা ঘুমুচ্ছে, ঘুমোক। নদীর বাউণ্ডারির ওপর অল্প অল্প করে উঠে এল ও। সপসপ করছে কাদা। কোথাও যে একটু বসবে তার উপায় নেই। বাউণ্ডারির উপর উঠে দাঁড়িয়ে থাকে শিবু।

সামনে নদীর জলে খেয়ালখুশিমতো এখন চাঁদ গড়াচ্ছে। চাঁদের দিকে ও তাকিয়ে থাকে। নদীর ওপার চোখে পড়ে না। আকাশ, নদী আর চাঁদের আলো মিলেমিশে একাকার হয়ে উঠেছে ওপারে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ঝাপসা একটা রেখার মতো ওর চোখে পড়ে। রহস্যময়। কে বলবে, ওপারেও রয়েছে মানুষের সংসার। কচুবেড়ের দিকে তাকাল শিবু, বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে যেন বরফ

পড়ে আছে রাশি রাশি। সাদা ধবধবে দেখাচ্ছে বাউণ্ডারির রেখা।

কিন্তু নদীর ঢালের দিকে তাকাতে সাহস হচ্ছিল না। মৃতদেহগুলি উঠে চলাফেরা করে বেড়াচ্ছে কিনা কে জানে। শিবুর সারা গায়ে আবার কাঁটা দিয়ে উঠল। বিশ্বাসই করা যায় না, এই নদীরই ঢাল বেয়ে ও হেঁটে এসেছে। কোন জীবন্ত মানুষ যে এই সাংঘাতিক পথ বেয়ে আসতে পারে তা ভাবতেও অবাক লাগে এখন।

রাত্রিটার আর কত বাকি অনুমান করার চেষ্টা করে শিবু। চাঁদ দেখে অনুমান করা কঠিন। তবু মনে হল, আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই হয়তো চারপাশ ফরসা হতে শুরু করবে। এখনই যদি ও বেরিয়ে পড়ে, প্রথম খেয়াটা ধরতে পারে তাহলে। দুপুরের আগেই তাহলে বাড়ি গিয়ে পৌঁছতে পারে শিবু। বেশ একটু উত্তেজনাবোধ করে ও।

কিন্তু এখনি কি বেরনো উচিত। চারপাশ এত স্তব্ধ যে সাহস হয় না। আর মাত্র কিছুক্ষণ পরেই তো ভোর হবে। এটুকু সময় কাটিয়ে যাওয়াই ভাল। শিবু ঝুপড়িটার দিকে তাকাল। আর তাকিয়েই কেমন চমকে উঠল, ঝাঁপি সরিয়ে বেরিয়ে আসছে সাবিত্রী। অদ্ভুত শীর্ণ দেখাচ্ছে মেয়েটাকে।

ধীরে ধীরে বাউণ্ডারির দিকে এগিয়ে এল মেয়েটা।

—ঘুম ভাঙল তাহলে? শিবু হাত এগিয়ে দিয়ে বাউণ্ডারির ওপর তুলে নিল ওকে।

সাবিত্রী মৃদু একটু হাসল, ঘুম! ঘুমুইনি তো। আপনি এখানে কি করছেন?

শিবু বলতে পারল না, সাবিত্রীকে কয়েকবারই ডেকেছে ও। যদি নাই ঘুমুবে, তবে উত্তর দেয়নি কেন। হেসে বলল, এমনি দাঁড়িয়ে আছি, চাঁদ দেখছি।

—চাঁদ দেখছেন। কেমন বিস্মিতচোখে তাকায় সাবিত্রী।

শিবু বলে, কোনদিন তো এভাবে চাঁদের দিকে তাকাইনি।

আজ আর চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে, চাঁদটাকে তাই না?

—আপনার সাহস আছে। একা একা এই বাঁধের উপর কেউ দাঁড়ায়। বুড়োটা দেখলে কিন্তু খুব খারাপ হত।

শিবু হাসে, অনেকবার ঘুমুবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তোমাদের মতো কিছুতেই ঘুমুতে পারি নি। তাই বেরিয়ে এলাম।

—আমি ঘুমিয়েছি বুঝি?

—দোষ কি! আমারও যদি ঘুম আসত, আমিও ঘুমুতাম।

—তাই বলে সারারাত এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন?

শিবু হাসে, না না, সারা রাত কেন! সারা রাত এখানে থাকা যায়! এইতো এলাম।

—একদম ভাল করেননি। সাবিত্রী কেমন তাকিয়েই থাকে, গায়ে তো ওই ভেজা কাপড়, তারপর এই ঠাণ্ডা।

—শিবুও হাসে, কখন ভোর হবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল সে কথাই ভাবছিলাম।

সাবিত্রীও আকাশের দিকে তাকায়, বোঝা গেল না সত্যি সত্যি ভোর হতে আরো কত বাকি!

—আমার তো মনে হচ্ছে, আর দেরি নেই। তাই ভাবছিলাম মন্দিরতলার দিকেই এগোব কি না!

—আমাকে ফেলে বুঝি পালাবার কথা ভাবছিলেন?

—না না, তা কেন! শিবু আবার হাসে, আমি ঐ বুড়োটার মতো নই। তোমাকে ঠিক পৌঁছে দেব।

শিবুকে এবার বুঝবার চেষ্টা করে সাবিত্রী। সামান্য কিছু আলাপ, এতে একটা লোককে কতখানিই বা বোঝা যায়। তবু মনে হল, পুষ্পটা সত্যি সত্যি ভাগ্যবান, ওর বরটা সত্যি সত্যি ভালো।

বলল, বুড়োটার আর দোষ কি বলুন। সবাই চায় আগে নিজে বাঁচতে। বুড়োটাও তাই চাইবে, তাতে দোষ কি!

—আমিও দোষ দিচ্ছি না। তবে আমি হলে ঐভাবে দুজনের সামনে একাএকা মুড়ি চিবোতে পারতাম না। লোকটা তো ভাল করেই জানে, দুদিন হল তোমার পেটে কিছু পড়েনি।

সাবিত্রী তর্ক করার চেষ্টা করে, সবাই নিজের কথা ভাবে। আপনিও ভাবেন, আমিও। ওতে দোষ নেই।

—সবাই নিজের কথা ভাবে না। প্রতিবাদ করে শিবু।

—ভাবে না! তবে, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

সাবিত্রীর কথা ঠিক বুঝতে পারে না শিবু।

—কেন বলো তো? তোমার কি ধারণা তোমাকে না ডেকেই আমি চলে যেতাম?

—না, তা হয়তো যেতেন না। তবে—

—কি তবে? কৌতুকে তাকিয়ে থাকে শিবু।

—আমি জানি, কার জন্য আপনি ছটফট করছেন।

—কার জন্য?

—পুষ্পর জন্য। পুষ্পর জন্যই আপনার ঘুম আসে নি।

কেমন বিব্রতবোধ করে শিবু।

সাবিত্রী হাসে, বলুন, ঠিক বলিনি? হাসলেও ওর চোখদুটো কেমন ম্লান দেখায়।

শিবু যুক্তি খোঁজে, ঠিক বে-ঠিকের কথা না। বাড়ির জন্য সত্যি সত্যি মনটা বড় ছটফট করছে। সে তো তোমারও।

সাবিত্রী আরও ম্লান হয়ে গেল, আমার কথা ছেড়ে দিন। আমি যে বেঁচে আছি এই তো ঢের। আমি তো নাও বাঁচতে পারতাম।

শিবু সাবিত্রীর চোখের দিকে তাকিয়েই আবার চোখ ফিরিয়ে নিল। চোখদুটো ওর ছলছল করছে। চাঁদের আলোয় ভারি অদ্ভুত হয়ে উঠেছে চোখদুটো।

প্রসঙ্গ ঘোরায় শিবু, আমার কিন্তু মনে হয় আর একটু পরেই ফর্সা হবে। আমরা বোধহয় এখনই মন্দিরতলার দিকে এগোতে পারি।

সাবিত্রী কেমন অবাক হয়, ওমা, এখনি? এই গভীর রাতে?

—রাত কোথায়। মন্দিরতলা পৌঁছতে পৌঁছতেই ভোর হয়ে যাবে।

সাবিত্রী একটুক্ষণ স্থির হয়ে রইল। ক্ষিধেয় সমস্ত শরীর এমন ঝিমঝিম করছে যে এখন ও হাঁটতে পারবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু না হেঁটেও তো উপায় নেই। যেভাবেই হোক ওকে হেঁটেই মন্দিরতলা পৌঁছতে হবে। ওখানে গেলে কিছু না কিছু একটা গতি হবেই।

বলল. ঠিক আছে, চলুন। আমি কিন্তু জোরে হাঁটতে পারব না।

শিবু বলল, আমরা ধীরে ধীরেই এগোব। দাঁড়াও, লাঠিটা নিয়ে আসি। ওটা হাতের কাছে রাখা ভাল।

ঝুপড়ির দিকে তিন লাফে এগিয়ে গেল শিবু। ভেতরে ঢুকে বেড়া থেকে ভেজা জামাটা টেনে নিয়ে কাঁধে ফেলল। তারপর লাঠি হাতে আবার বেরিয়ে এল বাইরে।

—চল। বুড়োটা এখনো হাঁ করে ঘুমুচ্ছে। বেশ মজা হবে; বুড়োটা ঘুম ভাঙলে দেখবে, আমরা নেই।

পা টেনে টেনে হাঁটতে শুরু করল সাবিত্রী। সামনে পা পড়তেই গোড়ালি ডুবে গেল স্যাঁতসেঁতে কাদায়। সারা গায়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত লাফিয়ে উঠল। কিন্তু গ্রাহ্য করলে চলবে না এখন।

মহা নিস্তব্ধতার মধ্যে ওরা দুটি দূরের মানুষ পাশাপাশি সাবধানে পা ফেলে ফেলে এগোতে থাকে। শিবুর মনে হল, ঝকঝকে চাঁদটাই এখন ওদের পথ দেখিয়ে সামনে সামনে চলেছে। কিন্তু নদীটা এখনো লকলক করে বুনো হিংস্র জন্তুর মতো নিজেরই গা চাটছে যেন।

রাত্রিটা ভোর হতে সত্যি সত্যি আর দেরি নেই। এই যা ভরসা।